KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর ওবায়দ
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫১/৫ ৫১/৬ ৫১/৭ ৫১/৮	Year of Publication : ভাদ্র ১৩৯৭ || Sep 1990 আশ্বিন ১৩৯৭ || Oct 1990 কার্তিক ১৩৯৭ || Nov 1990 অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ || Dec 1990
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

I. D. Roll No : KLMLGK

হুমায়ূন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের পথে বাধা মানুষের চতুর্বিধ অ্যালিয়েনেশন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে "মার্কসের পরম ইষ্ট" অনুসন্ধান করেছেন অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

বাঙলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষপর্ব নিয়ে দীর্ঘ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন আজহারউদ্দীন খান।

শিল্পজগৎ এবং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে সতীর্থকে দেয়া একটি বিরল সাক্ষাৎকারে শিল্পী গণেশ পাইনের সুচিন্তিত কিছু অভিমত, যা ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে।

"সেক্যুলারিজম", রাজনীতির "ক্রিমিনালাইজেশন" ইত্যাদি প্রসঙ্গে মনীষী আহমদ শরীফের ধারণাগুলি পর্যালোচনা করেছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসার্যমাণ ঐতিহ্যভাবনা নিয়ে শঙ্খ ঘোষের একটি গ্রন্থের আলোচনা

তামিল সাহিত্যিক ইন্দিরা পার্থসারথির পরিচয় এবং তাঁর একটি ছোটগল্প সরাসরি তামিল থেকে অনূদিত

সৈয়দ মীর্জার ছবি "সেলিম লেংড়ে পে মত রো" নিয়ে আলোচনা।

অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস রচনায় অনবধানতার দীর্ঘ অভিযোগ এনেছেন জনৈক মনোযোগী পাঠক।

সমাজতন্ত্রের সংকটে রোগনির্ণয় না করেই ব্যবস্থাপত্র দেয়া নিয়ে অপ্রকাশিত সেই পত্র।

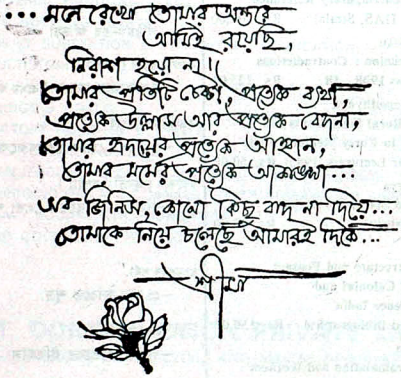

...মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

—শ্রীমা

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ৮
ডিসেম্বর ১৯৯০
অগ্রহায়ণ ১৩৯৭

মানুষের ধর্ম ও কার্ল মার্কস সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৫৮৯
বাঙলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষপর্ব আজলারউদ্দীন খান ৬০৪
প্রসঙ্গ গণেশ পাইন সমীর ঘোষ ৬২০
ঠাট্টা সুরজিৎ ঘোষ ৫৯৮
পড়ে আছে যমের দুয়ারে দীপতোষ মজুমদার ৫৯৯
দেয়াল মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৬০১
অর্ধশতকের অভিজ্ঞান কমলেশ চক্রবর্তী ৬০২
দ্বিতীয় পরিচয় মীনাক্ষী ঘোষ ৬১৩
গ্রন্থসমালোচনা ৬২৫
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজলি সরকার, সুজিৎ ঘোষ,
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
প্রতিবেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি ৬৪৪
কুতুবমিনার ইন্দিরা পার্থসারথি / সুব্রহ্মনিয়ম কৃষ্ণমূর্তি
সিনেমা ৬৫৩
সেলিম ল্যাংড়ে পে মত রো মেঘ মুখোপাধ্যায়
মতামত ৬৫৮
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অরুণশংকর দাশ, বেণু গুহঠাকুরতা,
পার্থসারথি রুজ

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

With best compliments from :

SUITI EXPORTS LIMITED

'TOBACCO HOUSE'

4TH FLOOR

1 & 2, OLD COURT HOUSE CORNER

CALCUTTA : 700 001

PHONES : 20-5331 (3 LINES), TELEX : 021-2443 MEPC, FAX : (9133) 28-0500

মানুষের ধর্ম ও কার্ল মার্কস

সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এক

বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে, গোড়ায় পৃথিবীতে অ্যামিবার মতো এককোষী জীবই শুধু ছিল। সে লক্ষ-লক্ষ বছর আগেকার কথা। সেই নগণ্য জীব অ্যামিবা থেকে আরম্ভ ক'রে, নানা পর্যায় অতিক্রম ক'রে—কালক্রমে,—মানুষের আবির্ভাব। মানুষও থেমে নেই। পর্বে-পর্বে মানুষেরও রূপান্তর ঘটেছে। একসময় মানুষ ছিল অরণ্যচারী। তারপর এসেছিল কৃষিপর্ব। বর্তমানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্প-পর্বের মধ্য দিয়ে চলেছে মানুষ। শিল্পোত্তর যুগের (post-industrial society) আগমনী সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে।

ক্রমবিবর্তনধারায় মানুষের মতো একটি জীবের আবির্ভাব 'কেন হল'—প্রশ্নের সদুত্তর এখনও মেলে নি। সময়ের মাপে, লক্ষলক্ষযুগব্যাপী ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে, "মানুষের পর্ব" শুধু ছোটো একটি অধ্যায় সন্দেহ নেই। সে যাই হোক না কেন, জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ এবং জন্তুজানোয়ারের জগৎ থেকে "মানুষের জগৎ" যে অনেকাংশে আলাদা তা নিয়ে আজ আর তর্ক নেই।

বিভিন্ন কালের ভাবুক, কবি আর দার্শনিক বিস্ময় নিয়ে এই মনুষ্যজীবের (যাদের নিয়ে "মানুষের জগৎ") দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, বলেছেন—'কী আশ্চর্য এই জীব !!' প্রায় সকলেই বলেছেন, জীবজগতে মানুষই শ্রেষ্ঠ প্রাণী। এই শ্রেষ্ঠত্বের অনেক কারণের মধ্যে একটি হল মানুষেরই মাথার খুলির মধ্যে অতি-জটিল এক পদার্থ, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ব্রেন,—বাঙলায় মস্তিষ্ক বা মগজ। মস্তিষ্ক যেন মস্ত এক আফিস ; কততার বিভাগ, কত উপ-বিভাগ, কত রকমেরই না তার কাজ। তা ছাড়া, মগজ বা মস্তিষ্ক আছে বলেই মানুষ চিন্তা করে, বিচার করে, ভালোবাসে, কবিতা লেখে, সঙ্গীত রচনা করে, আঁকে, বিজ্ঞানচর্চা করে, রেডিও-টি-ভি-কমপিউটার বানায়, ভবিষ্যতের "ছবি" আঁকে কল্পনায় ; আবার, কাম্যবস্তুকে পাবার জন্য "পথের সন্ধান" করে। সে পথও কতই না বিচিত্র।

অধিকাংশ মানুষই বোঝে যে মানুষ সত্যই অনন্য জীব। পঞ্চভূতে তৈরি হলেও মানুষ ইষ্টকখণ্ড বা লৌহখণ্ড নয়। মানুষ তালগাছ কিংবা বটগাছ কিংবা সুনীচ তৃণাদিও নয়। মানুষ কীটপতঙ্গ কিংবা পাখি, কিংবা গোপ্রাণীর ঠিক সগোত্রও নয়। বনমানুষকেও মানুষের সঙ্গে একপংক্তিভুক্ত করা যায় না। দেহ, প্রাণ, মন, চৈতন্য, আত্মবোধ (self-consciousness) নিয়ে যে মানুষ, তাকে জানা এবং বোঝা প্রায় দুঃসাধ্য। এজন্য অনেকে বলেন—'man the

unknown',—'অজ্ঞাত মানুষ'।

এই মানুষ সম্পর্কে মার্কস যা ভেবেছিলেন সেটাই তাঁর "দর্শন"।

দুই

মনে রাখা দরকার—মার্কস শুধু শ্রেণীসংগ্রামের ধ্বজাধারী নন, তিনি দার্শনিকও। জার্মানির ঞ্রুপদী দর্শনের উত্তরাধিকার বহন করেই তাঁর দর্শনের প্রতিষ্ঠা। কান্ট্, ফিখ্‌টে, শেলীং এবং হেগেলের (ফয়েরবাখেরও) দার্শনিক ঐতিহ্য থেকে মার্কস "অ্যালিয়েনেশন (alienation) তত্ত্ব" এবং "ডায়ালেকটিক পদ্ধতি"র সঙ্গে পরিচিত হন। ইউরোপের সাহিত্য—বিশেষত গ্রীসের কালোত্তীর্ণ সাহিত্য—পাঠ করে ভাবের জগতের রসসম্ভোগ করতে শেখেন। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, ভাবের জগতেও তাঁর অনায়াস প্রবেশাধিকার ছিল। আধুনিক ইউরোপের যে তিনটি বৈশিষ্ট্য রেনেসাঁস আর এনলাইটেনমেনট-এর পলিমাটিতে জন্মেছিল—যথা—বিজ্ঞান, সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি (doubt) এবং মানবতা (humanism)—এই তিনটিই মার্কসের দর্শন-প্রতীতিতে উপস্থিত ছিল।

তিন

মার্কস মানুষের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন: মানুষ এমন প্রাণী যে হাতিয়ার তৈরি আর ব্যবহার করে (tool-making animal)। চতুষ্পদ থেকে দ্বিপদ মানুষ যেদিন আবির্ভূত হল সেদিন ক্রমাভিব্যক্তির একটা মোড়-নেওয়া লক্ষ করা গেল। তখন থেকেই অন্য জন্তুজানোয়ারের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে গেল মানুষ। অনেক কাল মানুষ হাত দিয়ে মাটি আঁচড়ে জমিতে সামান্য ফসল ফলাত। কিন্তু কালক্রমে হাতের সঙ্গে হাতিয়ারকে (tool) মেলাতে শিখল মানুষ। হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ শিখল কাপড় বুনতে, তেল বার করতে, আগুন জ্বালাতে, বোঝা বইতে, রেল-এনজিন বানাতে, বিদ্যুৎ-শক্তিকে কাজে লাগাতে, কলকারখানা বানাতে। অল্প সময়ে নানা ধরনের বেশি কাজ করতে শিখল মানুষ। প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষ অনেক কিছুই নেয়, আবার বুদ্ধি খাটিয়ে, হাতিয়ারের সাহায্যে ক্রমশ বেশি-বেশি নিত্যনতুন বস্তু উৎপাদন করতে শেখে। হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছে বলেই মানুষ শুধুই ভোগ করে না, উৎপাদনও করে। শুধু হাত একদিন আদিম হাতিয়ারের কাছে হেরে গিয়েছিল। তেমনি নিত্যনতুন কলের কাছে আদিম হাতিয়ারও হেরে গেছে। এ নিয়ে মার্কস আক্ষেপ করেন নি। বুঝেছেন, এর আর উপায় নেই। মার্কস এও বুঝেছেন যে, হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতি মানুষের শ্রম-সময় কমিয়ে, কাজের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। এতেই মানুষের উন্নতি; তা না হলে মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর, এমনকী বনমানুষের খুব বেশি একটা তফাত থাকত না।

কিন্তু এহ বাহ্য আগে কহ আর।

চার

মার্কসের কথা হল, জীবজন্তুর জীবন থেকে উপরে কথিত বৈশিষ্ট্যই মানুষকে অনন্যতা (ইউনিকনেস) দিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে জন্তুজানোয়ারেরও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু তা ঘটে অজ্ঞানে, অচেতন-ভাবে। মাকড়শার জালের কথাই নেওয়া যাক। কিংবা মউমাছির চাক। আপাতদৃষ্টিতে মউমাছির সমাজে মউচাক-বানানো দেখে মনে হবে, "কী অদ্ভুত কাজ" নানা স্তরের কর্মীদের সাহায্যে, মনে হয়, কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মউমাছিরা কাজ করে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু তাদের কাজে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত অচেতন সংস্কারেরই প্রকাশ। অন্যদিকে,

মানুষ যখন পরিবেশের মুখোমুখি হয়, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য কাজ করে, তখন তার কাজ হচ্ছে 'সচেতন, উদ্দেশ্যমুখীন কাজ' (human activity, labour, praxis, practice)। জন্তু-জানোয়ারকে তাদের জৈবিক কার্যকলাপ দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। মাকড়শার জাল-বুনোনি দেখলে কুশলী তাঁতির কথাই মনে পড়ে; আর মউমাছি যে মউচাক তৈরি করে তা বহু দক্ষ স্থপতিকেও লজ্জা দেয়। এদের কাজে কী নিপুণতা, কারিগরি, কী বাহাদুরি!! মার্কস বলছেন, সবই ঠিক তবু কিন্তু মনে রেখো যে, মানুষের "সৃষ্টিশীল" কাজের (human activity) এমনই মহিমা যে, অদক্ষ স্থপতি একটা জায়গায় শ্রেষ্ঠ মউমাছিকেও ছাড়িয়ে যায়। যে ইমারত গড়ে তুলবেন সেটি তুলবার আগেই তাঁর কাঠামোটিকে 'নিজস্ব কল্পনায় রূপায়িত' করে নেন। মানুষ স্থপতির প্রতিটি সৃষ্টিশীল শ্রমপ্রক্রিয়ার শেষে আমরা এমন একটি পরিণতিতে (human, creative activity) উপনীত হই যা একেবারে শুরুতেই কর্মিকের ভাব-লোকে (imagination) রূপায়িত হয়ে উঠছিল। সৃষ্টিশীল কাজের এই "সচেতন উদ্দেশ্যমুখীনতা" জন্তুজানোয়ারের কাজে নেই।

অন্যভাবেও কথাগুলিকে সাজানো যায়। পশুও বাইরের প্রকৃতিকে ব্যবহার করে। তবে তার উপস্থিতি দিয়েই শুধু প্রকৃতির রাজ্যে যেটুকু পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। ওই পর্যন্ত। মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে পরিবর্তন আনে নিজের "উদ্দেশ্য" সাধনের জন্য। বিশ্বের সঙ্গে পশুর যোগ নিজের খাওয়া-শোওয়ার সম্বন্ধে। প্রয়োজনের তাড়নাতেই (necessity) পশুকে নিজের বাইরে যেতে হয়। মানুষের বেলায় দেখি, মানুষ যেমন বিশ্বের কাছ থেকে নেয়, তেমনি আপনাকে বিশ্বের কাছে নানারকমে দেয়। পশুরা বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে "এক টানে, এক তালে" চলে। মানুষই শুধু প্রকৃতির সঙ্গে শুধুমাত্র ঐক্যের যোগে যুক্ত হয়ে আঘাত করে। প্রয়োজনমতো প্রকৃতিকে বদলে নেয়, অগ্রসর হয়ে চলে। যে অর্থে গ্রহনক্ষত্রতারকা কিংবা মনুষ্যেতর প্রাণীর জগতের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির একটা "সামঞ্জস্য" আছে, বলা যায়, মানুষের কিন্তু সেই সামঞ্জস্য নেই।

আমাদের পঞ্চভূতের মধ্যে যখনই একটু বুদ্ধির সঞ্চার হল, একটা চৈতন্যের আবির্ভাব হল, আত্ম-বোধ জন্মাল, তাতে করেই দেহ-মন-প্রাণবিশিষ্ট সসীম জীব হয়েও আমরা এক নতুন পংক্তিতে উঠে গেলাম। আমরা "বিশ্বের অন্তর্গত", অথচ বিশ্ব থেকে আলাদাও। আমাদের স্বভাবের মধ্যে পুরোপুরি বিশ্বের সামঞ্জস্য আর ছন্দ নেই। আমাদের ভিতরকার নানা মহল থেকে রব উঠে: 'আরো চাই'। শরীর বলছে স্বাস্থ্য চাই, হৃদয় বলছে প্রেম চাই, মন বলছে সত্য চাই। জবাব আসছে, সৃষ্টি করো, উৎপাদন করো। ফসল তৈরি করো, হাতের সঙ্গে হাতিয়ারকে মিলিয়ে প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জকে আয়ত্ত করে জমিতে আনো উর্বরতা, কলেকারখানায় উৎপাদন করো নিত্যনতুন দ্রব্যসামগ্রী: দেহে আনো আরোগ্য আর স্বাস্থ্য, সৃষ্টি করো ভাবলোকের বিবিধ সামগ্রী। তুমিই তো খুদে বিশ্বকর্মা!

মানুষ দেহ-মন-প্রাণবিশিষ্ট জীব, সংক্ষেপে "দেহী জীব"। এই যে মানুষের বুদ্ধির এবং আত্মবোধের কথা বলা হল, এই দুটির জন্যই মানুষ প্রয়োজনের জগতের নিয়মের অধীন হয়েও, এই নিয়মকে বুঝে, জেনে, আয়ত্ত করে, প্রয়োজনাতীতকে খুঁজে বেড়ায়, অনেক সময় পায়; পেলে আনন্দ পায়। জগতের কর্মশালা আবশ্যকের জগৎ। এই কর্মশালার শরিক হিসাবে মানুষ জীবসীমায় আবদ্ধ। কিন্তু মানুষ যখন ভাবের রসশালার শরিক হয়, মহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ দেয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে, সঙ্গীত-কলা-বিদ্যা-সাহিত্য প্রভৃতির চর্চায় এবং রসাস্বাদনে তৎপর হয়, তখন মানুষ বিশ্বগত হয়ে ওঠে। মানুষের মধ্যেই আছে অমিতমানব (species being) [মার্কসের ভাষা]।

পাঁচ

পাঠক ভাবতে পারেন, এসব তো "ভাববাদী" কথা। এও ভাবতে পারেন—রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসার কথা আমি মার্কসের নামে চালাচ্ছি। মোটেই তা নয়। ইংরাজিতে তাই কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি "ক্যাপিটাল" আর অন্যান্য লেখা থেকে।

'What distinguishes the worst architect from the best of bees is this : that the architect raises his structure in imagination before he erects it in reality. At the end of every labour process, we get a result that already existed in the imagination of the labourer at its commencement. He not only effects a change of form in the material on which he works but he has also a purpose of his own [মার্কসের নিজের লাইন-টানা] that gives the law to his modus operandi'. [Capital—p 198. The Modern Library Tr. by S & E. Aveling].

মার্কস বলেছেন, আহার-অন্বেষণ, আশ্রয়-খোঁজা, পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো, বংশরক্ষা প্রভৃতি ধর্মের দিক দিয়ে বিচার করলে পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গের সঙ্গে মানুষের খুব একটা পার্থক্য নেই। পার্থক্যটা গভীরে গিয়ে বুঝতে হবে :

'To be sure animals also produce. They build nests, dwellings etc., like the bees, beavers, ants and others. But they only produce for their own or their offsprings' immediate needs ; they produce one-sidedly while men produce universally (মার্কসের আনডার-লাইন). They produce only under the domination of immediate physical needs while man produces independently of physical needs and really produces only when free of these needs. They produce only for themselves while man reproduces all nature ; their product belongs directly to their own physical body while man freely (মার্কসের আনডার-লাইন) faces his product. Animals create only according to the measure and need of the species, while man can produce according to the measure of every species, and can everywhere supply the inherent measure of the object. Hence man also creates according to the laws of beauty (মার্কসের আনডার-লাইন) : Literature & Art : Sydney—p 16.

মনে হবে, রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ছেন। গোঁড়া মার্কসবাদী বিস্মিত হয়ে ভাববেন, 'এ কী কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে।' মন্থরা অবশ্য কুচক্রী দুষ্টবুদ্ধি মহিলা। কাজেই কবিতার পংক্তিতে মার্কসের নাম বসিয়ে নিতে হবে। কিন্তু যে মার্কস নাকি বস্তুবাদী, শ্রেণীসংগ্রামের তাত্ত্বিক, তাঁর মুখে এসব "ভাববাদী" উদ্ভট কথা কেন? মার্কস যা বললেন, তার তাৎপর্যটা কী?

মানুষ যতক্ষণ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির নিয়মের অধীন (তথা সমাজের) ততক্ষণ সে শুধুই প্রয়োজনের সীমায় বাঁধা (necessity)। সেই অন্ধ অচেতন নিয়মের বাঁধন কাটিয়ে মানুষ যখন সজ্ঞানে, সচেতনভাবে কাজ করতে শুরু করে, অমনি শুরু হয় তার নিজস্ব মানবিক জগৎ (freedom)। এই জগৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত, মানুষী ইচ্ছা-অভিপ্রায়, এবং আদর্শের রসসিক্ত জগৎ। "আছে"র জগৎ থেকে এবং স্থূল বাস্তব জগৎ থেকে (change of form in the material) ঔচিত্যের এবং ইষ্টের জগতের দিকে অগ্রসর হওয়া (realises a purpose of his own)—এটাই মানুষের সাধনার নিয়ম—মানবধর্ম (gives the law to his 'modus operandi')।

ছয়

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ অবশ্যই কাজ করে। তা নেহাতই একপেশে আর সংকীর্ণ। তবুও মনে রাখা দরকার—মানুষের কর্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, প্রেমশক্তি আর জ্ঞানশক্তি বাধামুক্ত হয়ে "প্রয়োজনের সীমা"র বাইরে যে প্রয়োজনাতিরিক্ত "সৃষ্টি" করে, তখনই মানব-সৃষ্টি সর্বমানবে এবং সর্বকালে প্রসারিত হয় (Man produces universally)। এই প্রয়োজনাতীত সৃষ্টিশীল সম্পদ আছে বলেই মানুষ (মার্কস বলছেন) কীটপতঙ্গ ও জন্তুদের থেকে আলাদা। এই স্বতন্ত্রতা, এই অপূর্ব বস্তুসম্ভারনির্মাণ-ক্ষমতা, চেতনার এই প্রাচুর্য, মানুষের বেলায় অভিব্যক্তির পথ খোঁজে। শিল্পকলায়, সাহিত্যে মানুষ সুন্দরের সাধনাও করে। প্রকৃতি আর জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েও সেই বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যায়। মনের মাধুরী মিশিয়ে কত যন্ত্র, কত মন্ত্র, কত প্রতিষ্ঠান, কত প্রতীকী মূর্তি রচনা করে। সর্বত্রই, বিশেষত শিল্পে-সাহিত্যে, মানুষ প্রকাশ করে তারই 'মানবিক' স্বরূপকে ('can supply the inherent measure of the object' এবং 'creates according to the laws of beauty').

প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জকে জ্ঞানের আর কর্মের প্রযুক্তির আর বিজ্ঞানের বাঁধনে আনে মানুষ। বৈষয়িক উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তোলে। সমাজের শক্তিপুঞ্জকেও আপন বশে আনার চেষ্টা করে। সেজন্যই নানা আদর্শ, নানা তন্ত্র, নানা "ইজম" খাড়া করে মানুষ। বিষয়কে চেতনার রসে জারিয়ে, রূপের বাঁধনে এনে সৃষ্টি করে শিল্প-সাহিত্য-কৃতি-সংস্কৃতির জগৎ। এই সৃষ্টিশীল ক্ষমতার আধার মানুষই। স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করাটাই মানুষের ধর্ম (freely faces his product).

মার্কস জানতেন, মানুষের আছে "বিচিত্র রূপ"। কেজো মানুষ, ভাবুক মানুষ, শিল্পী মানুষ, বৈষয়িক মানুষ, সংগ্রামী মানুষ, সংসারাসক্ত মানুষ, নিরাসক্ত মানুষ—কতদিক থেকেই না মানুষকে দেখা যায়।

কিন্তু দার্শনিক মার্কস প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন মানবাত্মাকে। উদাহরণ দিয়েছিলেন ফুলের। বাগানে নানা ফুল ফোটে—গোলাপ, ভায়োলেট ইত্যাদি। গন্ধে, বর্ণচ্ছটায়, আকারে এরা আলাদা-আলাদা ফুল। ফুল যদি একে অপরের থেকে আলাদা হতে পারে, মানবাত্মার প্রকাশবৈচিত্র্যে আপত্তির কী আছে? একথা তো ভুললে চলে না যে, মানবাত্মাই (the spirit) সকল-ধনে-ধনী (the richest of all)। সকল-ধনে-ধনী এই মানবাত্মা সর্বৈশ্বর্যময়; এ যেন এক বহুতন্ত্রী বীণা। মার্কস বলেছেন : দেখো, এই বহুতন্ত্রী বীণাকে যেন একতারায় পরিণত কোরো না। যারা তা করার প্রয়াস পায়, তারা মানবলোকের মহাধর্ম হতে পতিত হয়।

মার্কস থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিই এই প্রসঙ্গে :

'You do not demand that a rose should have the same scent as a violet, but the richest of all, the spirit, is to be allowed to exist in only one form? [Literature & Art : Sydney—p 16]

আবার,

'Every dewdrop in which the sun is reflected glitters with an inexhaustible display of colours ; but the sun of the spirit may break into ever so many different individuals and objects ; yet it is permitted to produce one colour,—the official colour.'

এই মানবাত্মার স্বরূপলক্ষণ কী? মার্কস বলছেন : মানবসত্যই মানবজীবনের সারাৎসার (The essence of the spirit is always truth itself)"

সাত

ফরাসি দেশের দার্শনিক দেকার্ত (Descartes) দর্শনালোচনা আরম্ভ করেছিলেন এই স্বতঃসিদ্ধ থেকে: 'I think, therefore I am'। আমি চিন্তা করি, বিচার করি, অতএব 'আমি আছি'। মার্কসের কথা হল, 'I am active, I labour, therefore I am'। মানুষের স্বরূপই হল সৃজনশীল কর্মতৎপরতা। তাই মানুষ আছে। দেহী-জীব হিসাবে মানুষ প্রকৃতিরই সন্তান, আবশ্যকের জগতের বাসিন্দা। অন্যদিকে, মানুষ ধীশক্তিসম্পন্ন, আত্মবোধযুক্ত জীব, যে হাত আর হাতিয়ার দিয়ে, নিজের সৃজনশীল শ্রমশক্তি ব্যবহার করে, সততই নিজের "সৃষ্টি" তৈরি করে তুলতে আগ্রহী। প্রাণীর জগতে মানুষেরই শুধু নিজের সৃষ্টির এত প্রয়োজন। মানুষের সৃজনশীল শক্তির (human labour, human activity, praxis, practice) অনন্যতা বুঝেছিলেন বলেই মার্কস বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ইতিহাস কেবলই সৃষ্টির ইতিহাস। মানুষ সৃজনধর্মী আর্টিস্ট।

মূলধন-আশ্রিত ব্যবস্থার উত্থান-পতন, তার অন্তর্লীন নিয়মাবলীর বিচার-বিশ্লেষণে মার্কস জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন, একথা সত্য। তার কারণ মার্কস উনিশ শতকের মূলধনতন্ত্রের চেহারা প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রবহমান ইতিহাসে মূলধনতন্ত্রকে দেখেছেন একটা বিশিষ্ট অধ্যায় হিসাবে। কিন্তু মার্কসের মানবতাবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠা অ্যালিয়েনেশন-তত্ত্বে (theory of alienation)। এই তত্ত্বটির অনুশীলন করেই মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে সমাজের এবং মানুষের নিজস্ব স্ববিরোধিতার প্রসঙ্গে মার্কস নিজস্ব মতামত রেখেছেন।

The Shorter Oxford Dictionary 'alienation' পদটির অর্থ করেছে: (ক) the action of estrangement or state of estrangement; (খ) the action of transferring ownership to another; (গ) diversion of anything to a different purpose; (ঘ) the state of being alienated; (ঙ) loss or derangement of mental faculties; insanity.

ইউরোপের নানা ভাষায় "অ্যালিয়েনেশন" পদটি অপ্রকৃতিস্থ কিংবা উন্মাদ ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। হেগেল, ফয়েরবাখ আর মার্কস পদটি ব্যবহার করেছেন স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপটে, স্বতন্ত্র দার্শনিক অর্থে। আধুনিক কালে আত্মচ্যুত (alienated) ব্যক্তি বলতে এমন ব্যক্তিকেও বুঝি, যে হয়তো অপ্রকৃতিস্থ নয়, কিন্তু নানা কারণে যে উদ্‌ভ্রান্ত আর দিশেহারা! আগেই বলেছি, হেগেলই আধুনিক কালে অ্যালিয়েনেশনের সমস্যাটি তুলে ধরেন। পরে ফয়েরবাখও প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেন। হেগেলের আলোচনা তাঁর স্বকীয় ব্রহ্মবাদের (theory of the absolute) পটভূমিকায়: ফয়েরবাখের আলোচনা নৃতাত্ত্বিক (anthropological) দর্শনের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। মার্কস হেগেলের alienation of Idea-কে মানব-ইতিহাসের, বিশেষত, শিল্পপূর্বের পটভূমিকায় স্থাপন করে মূর্তরূপ দিয়েছেন। ফয়েরবাখের alienation of abstract man-কে অনেক গভীরে নিয়ে গেছেন।

আট

মার্কসের মতে, মানুষই বিশ্বকর্মা; মানুষের শ্রমই সৃষ্টির উৎস। মানুষই (কায়িক এবং মানসিক) শ্রমের সাহায্যে পণ্যসামগ্রী তৈরি করে, স্তূপাকার করে তোলে দ্রব্যসম্ভার। এই সৃজনশীল শ্রমের সাহায্যেই নানা দেশের মানুষ গড়ে তোলে কত সৌধ আর ইমারত, কত নগর আর শহর, কত স্থাপত্য আর ভাস্কর্য। সৃষ্টি করে কত আকৃতির রাজ্যতন্ত্র, কত

আইন, কত শাসনব্যবস্থা, কত রকম-বেরকমের শিক্ষা-দীক্ষা। ধীশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টিশীল মানুষই কত লেখে, কত আঁকে, কত গৃহ, কত সমাজ বাঁধে, কত ধর্মমত ফাঁদে। সৃষ্টি করে কত অনুষ্ঠান, কত প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টিশীল শ্রমের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজেকে পায়; শ্রমের মধ্য দিয়েই সকলের সঙ্গে মিলে "সর্বগত" হয়ে উঠে।

আগেই বলেছি, মানুষ মউমাছি নয়, কীটপতঙ্গ নয়, অশিক্ষিতপটু জন্তু থেকেও মানুষ আলাদা। সে কেবল গতরে খাটে না (এই অর্থে মার্কস 'labour'-পদ ব্যবহার করেন নি; কায়িক, মানসিক সাহিত্যিক, নান্দনিক সব সৃজনশীল কর্মই এর অন্তর্ভুক্ত), শুধু পণ্য-উৎপাদন করে না। শুধু বাণিজ্য ও রাষ্ট্র নিয়ে তার কারবার নয়। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম আর সমাজ নিয়েও মানুষের কর্মপ্রবাহ চলে। নিজের আঁচলে ঢেকে প্রকৃতি মানুষকেই শুধু চালাতে পারে না। নিজে চলতে গেলে বিপদ আছে জেনেও এই মানুষ চলৎশক্তিকে আটকে রাখতে পারে না। সৃজনশক্তি (ধীশক্তি-সহ) আছে বলেই চারিদিকে যা আছে তাতেই মানুষ আসক্ত হয়ে নেই। যা তার কাছে নেই তাকেও আয়ত্ত করতে চায় মানুষ। মানুষের ধর্মই হচ্ছে এই যে, যা সবচেয়ে বাধা দেয়, তাকেই আপনার একান্ত অনুগত করে তুলতে চায় সে। আগেই বলেছি, মার্কসের মতে, মানুষই, এক অর্থে, বিশ্বকর্মা। এই জন্যেই আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করে মানুষ।

কিন্তু মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে। একদিকে মানুষ পরাসক্ত, বদ্ধ, জীববাসীমায় আবদ্ধ। মানুষের সৃজনশীল শ্রম, ইতিহাসের কোনো সমাজেই, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের পথ পায় নি, পরবশ্যতার শৃঙ্খলে বাধা পড়েছে। প্রাক্‌শিল্প-পর্বে মানুষ ছিল আত্মচ্যুত (alienated)। অভাব, অপ্রাচুর্য আর দৈন্যের কারণে। শিল্পপর্বে মানুষের শ্রম ভেলকিবাজির মতো উৎপাদনের এবং বিনিময়ের এক বিশাল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। মানুষের শ্রমশক্তি (হাত-হাতিয়ার-যন্ত্র-ধীশক্তি) মন্ত্রবলে যেন, পাতালপুরীর শক্তিদমূহকে জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু মানুষের "অ্যালিয়েনেশন" এই সমাজে আরও পূর্ণতা লাভ করেছে। যে বস্তু-সম্ভার আর সম্পদ, যে তন্ত্র, মন্ত্র মানুষ সৃষ্টি করেছে, তা স্রষ্টাকেই গ্রাস করতে উদ্যত। সমকালীন উন্নত সমাজে তাই দেখা যাচ্ছে প্রাচুর্যের অ্যালিয়েনেশন (affluent alienation)।

পুনরুক্তি করে আবার বলা প্রয়োজন যে, মার্কস-আত্মচ্যুতি ও আত্ম-আবিষ্কারের পটভূমিকায় প্রকৃতি, মানুষ আর সমাজের বিচার করেছেন। জীবনচর্চার সকল ক্ষেত্রে মানুষ যে মহিমময় হয়ে উঠতে পারে নি, আজও যে মানুষ জ্ঞানে-কর্মে, স্নেহপ্রেমপ্রীতিতে, সুন্দরের সাধনায় সার্থকতালাভ করে নি, নিত্য-নবসৃষ্টিক্ষম মানুষ আশু প্রয়োজনের বৃত্তে ঘুরে-ঘুরে জীবনপাত করে চলেছে আজও, তার কারণ হিসাবে "শ্রমের অ্যালিয়েনেশন"-কে চিহ্নিত করেছেন মার্কস।

নয়

উনিশ শতকের শিল্পায়িত, যন্ত্রবহুল সমাজের কর্ম-পরিস্থিতি দেখে (work-situation) মার্কস চার ধরনের অ্যালিয়েনেশনের কথা তুলেছেন:

(ক) কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছেদ (alienation from the process of work), (খ) সৃষ্ট বস্তু হতে বিচ্ছেদ (alienation from the products of work), (গ) অপর মানুষ হতে বিচ্ছেদ (alienation of the worker from others), (ঘ) নিজের মানবিক স্বরূপ হতে বিচ্ছেদ (alienation of the worker from himself)।

মার্কস লিখেছেন: What then constitutes the alienation of labour? Firstly, in the fact that labour is *external* to the worker; i.e., it

does not belong to his essential being, in the fact that he therefore does not affirm himself in his work but negates himself in it, that he does not feel content, but unhappy in it. His work is not therefore voluntary but coerced, it is *forced* labour. It is, therefore, not the satisfaction of a need but only a *means* of satisfying needs external to it.

Secondly, the relation of the worker to the *product of labour* as an alien object exercising power over him. The result, therefore, is that man (worker) no longer feels himself acting freely except in his animal functions in eating drinking and procreating, while in his human functions he feels more and more like an animal.

Thirdly, alienation of labour therefore turns the *gensic being of man*, into a being alien to him. It alienates his own body from man ; it alienates from him both nature outside him and his intellectual being, his *human* nature.

Fourthly, a direct consequence of the fact that man is alienated from the product of his labour, from his life-activity, from his gensic being is the *alienation of man* from man.

দশ

মার্কস যে মানবতাবাদী তার প্রমাণ—মানুষকে নিষ্ক্রিয় ও নিরগুণ করে একপাশে সরিয়ে না রেখে মানুষকেই তিনি বসালেন জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে ; স্বীকার করলেন যে, মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য যে "সৃজনশীল শ্রম", সেটাই ইতিহাসের মূল শক্তি। মানুষের সৃজনশীল শ্রম শুধু তো অর্থনীতির প্রত্যয় নয়। মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে, মানুষের সচেতন কর্মধারার সঙ্গে, মানুষের বিশ্বগত হয়ে ওঠার সঙ্গে, এই শ্রমেরই আত্যন্তিক যোগ। মানুষ যে তার সুপ্ত ক্ষমতা বিকশিত করে বিশ্বানুগ (universal) হয়ে উঠতে পারে, সেও এই সামাজিক শ্রমেরই মাধ্যমে। সামাজিক শ্রমের মধ্য দিয়েই মানুষ প্রকৃতি ও সমাজকে বিচিত্র রূপ দেয়, নিজেকে প্রকাশ করে নিত্য নবরূপে।

এগারো

উনিশ শতকের শিল্পায়িত সমাজ শ্রমবিভক্ত, অর্থলোলুপ ভোগবাদী সমাজ। এ সমাজে মনুষ্যত্ব তুচ্ছতা আর সীমার বাঁধনে পীড়িত। এ সমাজে অ্যালিয়েনেশন সর্বব্যাপক হয়ে ওঠে। অ্যালিয়েনেশন আছে বলেই এ সমাজে শ্রমজীবী যত বেশি উৎপাদন করে, ততই তার নিজের ভোগের কোঠায় টান পড়ে (তুলনামূলকভাবে)। এ সমাজে মানুষ যত বেশি মূল্যসৃষ্টি করে, ততই তার নিজের মূল্যহীনতা প্রকট হয়। তার সৃষ্টবস্তু যতই মনোরম হয়ে ওঠে ততই সে নিজে আকার-প্রকারহীন বস্তুতে রূপান্তরিত হয় (thingified)।

'The more riches the worker produces, the more his production increases in power and scope, the poorer he becomes. The more commodities a worker produces, the cheaper a commodity he becomes. The devaluation of the world of men proceeds in direct proportion to the exploitation of the world of things.'

পুনরায় —

'The more the worker produces, the less he has to consume, the more value he creates, the less value, the less dignity—he himself has ; the better-shaped the product, the more misshapen the worker ; the more civilised his product, the more barbaric the worker.'

শুধু শ্রমজীবী মানুষই নয়, শিল্পপতিরাও আত্মচ্যুতির শিকার। তারাও অ্যালিয়েনেশনের দায়ভাগ বহন করে চলে। পার্থক্য শুধু এইখানে যে, শ্রমজীবী মানুষ অ্যালিয়েনেশনসঞ্জাত দুঃখের ভারে পীড়িত, কিন্তু শিল্পপতিরা এই অবস্থায় অখুশি নয়, এবং আত্মচ্যুতির মধ্যেই আপাত শ্রেয়কে খুঁজে পায়—মনে করে 'আমরা কতই না শক্তিধর'। শ্রমজীবীরা আত্মচ্যুতির অভিঘাতে নিজেকে ভাবে দীনদুঃখী ও শক্তিহীন। দু পক্ষই মানুষের স্বধর্ম হতে ভ্রষ্ট।

'The propertied class and the class of the proletariat present the same human self-alienation. But the former class finds in this self-alienation its confirmation and its good, its *own power*. It has in it a *semblance* of human existence. The class of the proletariat feels annihilated in its self-alienation ; it sees in it its own powerlessness and the reality of an inhuman existence.'

কি দাস-সমাজে, কি সামন্ত-সমাজে, কি পুঁজিবাদী-সমাজে মার্কস অ্যালিয়েনেশনের প্রকাশ দেখেছেন। স্বরাট, সৃষ্টিশীল মানুষ যখনই প্রকৃতির কাছে, ভূতপ্রেতের পায়ে, ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করেছে, মানবাত্মা যে সর্ব-ঐশ্বর্যময় একথা ভুলে "নিজেরই সৃষ্টি"র কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে তখনই বোঝা গেছে মানুষ আত্মচ্যুত। এই আত্মচ্যুতির প্রকাশ আইনে, দর্শনে, ধর্মমোহে, পণ্যপূজায় (commodity fetishism), টাকার থলির পূজায় (money fetishism), রাষ্ট্রদেবতার পূজায়, পার্টিপূজায়। আরো কত অপদেবতার পূজাই না মানুষ করে চলেছে। অর্থনৈতিক শোষণে যেমন মানুষের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব নয়, তেমনি শ্রমবিভাগ, টাকার দাসত্ব, অতি-লোভ এবং অতি-ভোগ, পরবশ্যতা—এ সবই মানবীয় সত্তাকে যে খণ্ডিত করে, মার্কস তা স্বীকার করেছেন।

বারো

সাম্যবাদী সমাজ কাম্য কেন? এ সমাজে উৎপাদনের হার বেড়েছে, সম্পত্তির উপর ব্যক্তিমালিকানার নিরাকরণ হয়েছে, শুধু এজন্য নয়। এ সমাজে "শ্রম" রূপান্তরিত হয়েছে প্রকাশধর্মী সাত্বিক কার্যকলাপে এবং বন্ধনমুক্ত মানুষ পূর্ণপুরুষ হিসাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। মার্কস তাই বলেছেন,

'Communism is the re-integration or return of man to himself, transcendance of human self-alienation.'

স্বপ্নাতুর মার্কস ভেবেছিলেন, সাম্যবাদী সমাজে শ্রম রূপান্তরিত হবে স্বতঃপ্রবৃত্ত আনন্দযজ্ঞে ; ব্যক্তি হয়ে উঠবে পূর্ণতর। তাঁর কথা—

'Only at this stage does self-activity coincide with material life, which corresponds to the development of individuals into *complete individuals*.'

মার্কসের লেখার সর্বত্র এই ব্যক্তিমুক্তির কথা। ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশই মার্কসের পরম-ইষ্ট। মার্কসের কল্পিত সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তির বাধমুক্ত বিকাশই মুখ্য—পরম-পুরুষার্থ। এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের মধ্য দিয়েই সমষ্টি-কল্যাণ-ও সাধিত হবে। সেই সমাজ হবে—

'An association in which the *free development* of each is the *free-condition* for the free-development of all.'

ঠাট্টা

সুরজিৎ ঘোষ

মিছিলে মিছিলে চরণচিহ্ন মুছে যায়
আমি চিনতে পারি না সুন্দর
তুমি কোন্ পথে এলে কার পদযাত্রায়।
লাল শালু না কি গৈরিক লাঞ্ছনা,
কী ছিল তোমার চিহ্নপতাকা
নিজেই তা জানতে না?
শুধু গোলপার্ক-বিবেকানন্দ থেকে
কাকভেজা ভোরে হেঁটে গিয়েছিলে
ব্রিগেড ছাড়িয়ে মহাকরণের দিকে
কোন্ প্রতিবাদে মিলেছে সেখানে ভাষা
সব স্বপ্নেরই ভুল অনুবাদে, নাকি
সময়ের হাড়ে কাঁপনলাগানো ছদ্মবেশ সে তামাশা।

পড়ে আছে যমের দুয়ারে

দীপতোষ মজুমদার

১

দেবতারও ইঁট চাই, সিমেন্টের দর জানা চাই
কাগজে বুলোন চোখ, শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে জমির সন্ধান আছে কিনা।
সব চেষ্টা বৃথা হলে নজর কেড়েছে ওই সতীর্থের ইমারত
মনে ধরে চাতাল, গম্বুজ
দাবি ওঠে, কাগজপত্তর কিছু নেই, তবু দাবি ওঠে
'এ জমি আমার, বেদখল হয়ে গেছে, এ জমি আমার!'
তারপর, লেঠেলের দল
ছেয়ে যায় ভূভারতে, উনিশশো নব্বুই-এ অক্টোবরে।

২

পুলিশের গুলি থেমে গেছে
এখন টহল।

ছায়ার আড়াল থেকে ঘরফেরতা মানুষেরা ছিটকে আসে প্রাণ হাতে নিয়ে
দূর থেকে বোঝা যায় না, সে প্রাণের দীপ ওরা কোথায় জ্বেলেছে
সে কি মন্দিরে, মসজিদে নাকি শিরদাঁড়ার হিমেল সোপানে?
বন্ধ কানাগলি বুঝি নৈবেদ্য চেয়েছে, তাই
ম্যানহোলের প্রণামী থালায়
জমে আছে ছেঁড়া চটি, কাটা হাত, মানুষের পাগড়ি আর
অবরুদ্ধ শেষ আর্তনাদ
বাড়িগুলো কেঁপে উঠছে মাটির তরাসে
আর অন্ধকারে শিউলিগাছ,
বীরবাহু শমীবৃক্ষ সেও।

আছে ধর্ম,
আজও খুব ল্যাজ নেড়ে বয়োজ্যেষ্ঠ কুকুরের মতো
প'ড়ে আছে যমের দুয়ারে।

৩

ভোরের আলোয় মাঠের সবুজ এগিয়ে এলে
শুধোই ওকে,
'তুমি সে অজ্ঞান না?'
বুকের ভিতর গুমরে ওঠে কান্না।

দেখো, আমার চোখের ফসল দিগন্তময়
ভরিয়ে দিল পান্না
বুকের ভিতর গুমরে ওঠে কান্না।

এ পথ দিয়ে মানুষ হাঁটে, দেবদূতেরা কদাচিৎও
যান না
বুকের ভিতর গুমরে ওঠে কান্না।

নবান্ন কী বলছে এমন অগ্রহায়ণ বাজবে তোদের
অযোধ্যা আর ফৈজাবাদেও?
সেই ধ্বনি তো মানুষ দেবে মৃদঙ্গে আর একতারাতে,
বহির্মুখী অন্ধ ভগবান না
বুকের ভিতর গুমরে ওঠে কান্না।

সে গান তোরা গুঁড়িয়ে যাবি, একা আমার—
তোদের অপমান না?
বুকের ভিতর দুমড়ে গেল কান্না।

আমার ঘ্রাণে জড়িয়ে আছে ইতুপুজোর রান্না, সে ভোগ
রক্তপিশাচ দেবদেবীরা খান না
বুকের ভিতর গোঙানি আর কান্না।

তার চেয়ে আয় সদলবলে জড়িয়ে রশি
পাথরগুলো টান না!
আমার বুকে আগুন হবে কান্না।

দেয়াল

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

এখন তোমার সঙ্গে
আবহাওয়া বিষয়ক কথাবার্তা হয়
রাজনীতি নিয়ে কিছু টুকরোটাকরা কথা
কদাচিৎ কখনো সখনো
তোমার কলিগ
সুজাতা, কিরণ, এষা, কুণাল, সৌরভ
এদের কথাও—
ব্যস! তারপর চুপচাপ
সারাদিন কথাহীন
এভাবে জীবন যায়
ডাইনী নদীর দিকে
এখন জ্যোৎস্নায়
বড়ো বেশি মনস্তাপ হয়
পাখির ডাকের রিনরিন
শুনলে শুধু মনে হয়
কোথায় রেখেছি আভোমিন।

এখন তনহাই
কাছে আছি
মাঝখানে পুরু এক হাওয়ার দেয়াল!

অর্ধশতকের অভিজ্ঞান

কমলেশ চক্রবর্তী

শূন্যের নক্ষত্র বিচ্যুতি দেখেছি একাএকা
পদতলে নিরলঙ্কার পথ
পশ্চাতের মরীচিকা সম্মুখের অলীক আঁধার
করেছে মলিন আরো
কণ্ঠস্বরে ছিলো যে উজ্জ্বল তীব্র তরবারি।

ভেজা রাত্রি পড়ে খসে নির্মেঘ আকাশ থেকে
রক্তের প্রবাহে শুনি
হলদিঘাটের অশ্বখুরধ্বনি
সম্রাজ্ঞী, কণ্ঠের মালা দিলে তুমি কারে
এই অর্বাচীন অন্ধকারে
ম্লান আবছায়া চাঁদ কাঁপে তার চোখের পল্লবে
ছিলো প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ ভরপুর
উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষায়
জানা ছিলো একক রাত্রির সহবাস তৃপ্ত করে
আজন্মলালিত আর্তি
নিদ্রায় ঘটে সমাপ্তি :
অশ্বের মতন অতঃপর পেশীর যুগল উন্মাদনা
যেন নাবিকের রাত্রিশেষে আবিষ্কৃত দ্বীপপুঞ্জ।

যন্ত্রণার তীব্রতায় নিঃসঙ্গ আমার একান্ত প্রবাস
তবু জানি মানুষেরা নিয়োজিত
স্মৃতিসিক্ত অলৌকিক কাজকর্মে :
অতএব আর্ত চীৎকারে জ্বলে ভয়াবহ মলিন আগুন
কাহাদের আর্ত চীৎকারে তীরে ভাঙ্গে সমুদ্রের পুচ্ছধারী ঢেউ
অন্ধ পাখিদের চলে অবিমিশ্র ওড়াউড়ি চতুষ্পার্শ্বে

রাত্রির সমুদ্র হয় উন্মোচিত কিসের গৌরবে
যেহেতু ধরেছে এ-সমুদ্র রমণীর রমণীয় অবয়ব,
নাবিক, তরণী এবং আকাশ
আছে মিলেমিশে অসম্ভব প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ।

দুপুরের ঘর্মাক্ত মুখোশ খুলে গেলে
আনন্দিত উত্তাল উল্লাস

চূর্ণ করে জীবনযাপন
যেন দূরে পাহাড়ের পশ্চাতের নিয়মিত অমোঘ সূর্যাস্ত
দেখো তার অর্ধশতাব্দীর মুখ
দেখো হিরণ্ময় মহাদেশ বিচিত্র বর্ণের প্রাচুর্যে অঙ্কিত
মানুষের লৌকিক অভিনন্দন
সুবাতাস বয়ে যায় তোমার সমুদ্রে
যাও যাত্রায় হে, বৃদ্ধ নাবিকের মতো
খুঁজে ফেরো যন্ত্রণার উৎসের মুখ
থাক পরিত্যক্ত সুচারু প্রস্তুতি এই নীলিমামণ্ডিত
ঋতুবতী সলজ্জ শয্যায়
কম্পাসের কাঁটার মতন নিঃশব্দে
উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম নীলিমায় তোমার শরীর
মানস ভ্রমণে নিয়োজিত আকাঙ্ক্ষার শয্যাজুড়ে।

বাঙলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষপর্ব

আজহারউদ্দীন খান্

'আমাকে বঙ্কিমচন্দ্রের যে দিকটির কথা বলতে বলা হয়েছে সেটি খুবই স্পর্শকাতর। বিশেষ করে আমি যে সম্প্রদায়ের লোক, তাকেই এই বিষয়টি দিয়ে একটু বিপদজনক অবস্থায় ফেলা হয়েছে। এখানকার শ্রোতারা আমার বক্তব্যকে ঠিক কী দৃষ্টিতে বিচার করবেন আমার জানা নেই। হয়তো সবশেষে এমনও বলবেন, এরকম বলাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। আমার অবস্থা শাঁখের করাতের মতো—এগুলেও বিপদ, পিছোলেও বিপদ। সত্য কথা না বললে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হয়, আবার বললেও অপ্রিয় হতে হয়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে : বঙ্কিমের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অন্য কারুর থেকে কম নয়। বঙ্কিমের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আজ নতুন নয়। যে-অভিযোগ একটি সম্প্রদায় থেকে প্রবলভাবে উত্থাপিত হয়েছে, এবং সেই অভিযোগের মধ্যে সারবত্তা থাকা সত্ত্বেও তার উপযুক্ত জবাব বঙ্কিম-সমালোচকরা আজও দেন নি। এমনও হতে পারে দেবার মতো নেই বলেই দিতে পারেন নি। দোষে-গুণে মানুষ। মানুষ বঙ্কিম শিল্পী বঙ্কিম দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নন। বঙ্কিমজন্মশতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ প্রবলভাবে উত্থাপিত হয়েছিল। তার আগে মুসলিম বুদ্ধিজীবী -সম্পাদিত পত্রপত্রিকায় বাদপ্রতিবাদ হয়েছে। রেজাউল করিম "বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ" গ্রন্থে (১৩৪৫) তার একটি জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটি ইতিহাসভিত্তিক হয় নি। যুক্তির চেয়ে আবেগ উচ্ছ্বাস বেশি ছিল, মানুষের সস্তা সেন্‌টিমেন্‌টকে মূলধন করা হয়েছিল, যদিও বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন যদুনাথ সরকার। "আনন্দমঠে"র শতবর্ষপূর্তি উৎসবে এবং বঙ্কিমের দেড়শত জন্মবর্ষেও এই পুরোনো অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ অনেক সুধী ব্যক্তিও স্বীকার করে নিয়েছেন।'

উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক

আলোচ্য-প্রবন্ধটি "সাম্প্রদায়িকতা ও বঙ্কিমচন্দ্র" শিরোনামে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়-আয়োজিত বঙ্কিম সেমিনারে ২৫. ১. ১৯৯০ তারিখে পড়া হয়। যে কথাগুলি সর্বাগ্রে শ্রোতাদের উদ্দেশে নিবেদন করে লেখক প্রবন্ধপাঠ শুরু করেছিলেন, জরুরি মনে হওয়ায় প্রাবন্ধিকের সেই কথাগুলি হুবহু এখানে উদ্ধৃত হল।

থাকলেও একটি বিষয় আজ স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত যে বাঙলায় আদৌ কোনো জাগরণ যদি এসে থাকে তবে তা প্রধানত হিন্দু জাগরণ, যাঁরা ইংরেজের অনুকম্পা পাবার আশায় ইংরেজের স্তাবকতায় ধন্য হবার মধ্যে গৌরববোধ করেছেন। ইংরেজি শিক্ষা এবং শাসনকার্যে যোগদান করার বিষয়ে তাঁরা সেদিন অগ্রণী ছিলেন। এই আলোকপ্রাপ্ত লোকেরাই সেদিন সমাজ এবং ধর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করেছেন এবং যাবতীয় ভাবনা-চিন্তা একটি সমাজকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তনের ধারাও স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ ছিল। সব ভাবনা-চিন্তাই যে প্রগতিশীল ছিল, তাও নয়—দুটোই ছিল, তবে কম-বেশি ছিল। সেই ঔপনিবেশিক সমাজের যুগে দু-এক জন পুরোমাত্রায় প্রগতিশীল ছিলেন—যেমন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আবার এঁদেরই সঙ্গে কিছু প্রতিক্রিয়াশীল মানুষও ছিলেন, যাঁরা জাতপাতধর্ম নিয়ে বড্ড বেশি শোরগোল করেছেন। একদিকে ধর্মীয় সংস্কার ভাঙার জন্য সতীদাহপ্রথা, বহুবিবাহপ্রথা বিলোপ, কিংবা বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ইত্যাদি সামাজিক প্রগতির পক্ষে ছিলেন, তেমনি অপরদিকে একদল তার বিরুদ্ধাচরণ করে সাবেকি সনাতনী সংস্কারকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবু সব বাধাবিপত্তি এড়িয়ে তখনকার সমাজ মোটামুটি প্রগতিশীলতার দিকে এগিয়েছে। সে সময়কার সাহিত্য কিছুটা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিল, কাজেই কিছুটা স্বাধীনতাবাদীও ছিল। কিছু পিছুটান থাকার জন্য অর্থাৎ জমিদারতন্ত্র, চাকুরির ওপর নির্ভরশীল ছিল বলে গণতন্ত্রবাদী সামন্তবাদবিরোধী হয়ে উঠতে পারে নি। মাঝে-মাঝে সেই সময়কার সাহিত্যিকরা এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোলায়মান ছিলেন। এই দোলাচলের আবর্তে বঙ্কিমচন্দ্রও পড়েছেন। কখনও তিনি প্রতিক্রিয়াশীল, কখনও তিনি প্রগতিশীলতার পক্ষে। এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাঁর সাহিত্যেও আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক কিনা, তা বিচার করার আগে সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমরা কী বুঝি, সেটাই আলোচনা করা ভালো। জাতীয়তাবোধ এবং প্রাদেশিকতার মধ্যেও আছে সাম্প্রদায়িকতা। জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে সাধারণত ধর্ম, দেশ এবং জাতিকে কেন্দ্র করে। বিপান চন্দ্র সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, 'Simply put, communalism is the belief that because a group of people follow a particular religion they have, as a result, common social, political and economic interests.' (*Communalism in Modern India*, p. 1, 1984) জাতীয়তাবোধ যতদিন না আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত হচ্ছে ততদিন এক ধরনের সংকীর্ণতা থেকেই যাবে। আমাদের দেশে এই সংকীর্ণতার শুরু উনিশ শতক থেকে—এই শতকে যে জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল তাতে সমগ্র ভারতের কথা ছিল না; প্রাদেশিকতা—অর্থাৎ একটি রাজ্য একটি ধর্ম একটি জাতিকে কেন্দ্র করেই জাগরণের কথা ভাবা হয়েছিল। এই সংকীর্ণতা থাকার জন্যই ভারতের ইতিহাস যা এতদিন লেখা হয়েছে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত ছিল নিজ ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট। নিজ ধর্ম-বর্ণ-ভাষার প্রতি অন্ধ আনুগত্য থাকার দরুন এক ধরনের আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে সত্যকে নির্দিষ্ট ছকে ফেলে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করার ফলে ইতিহাস একপেশে হয়ে গেছে। এই ধরনের ইতিহাস-রচনা উনিশ শতক থেকেই শুরু হয়েছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই-জাতীয় ইতিহাস রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন যার মধ্যে নিজ ধর্ম নিজ সম্প্রদায় আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়; আর অন্য ধর্মের মানবগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, উপেক্ষা, সংঘাত সৃষ্টি করারও সুযোগ থাকে। রবীন্দ্রনাথ এই-জাতীয় ইতিহাস রচনার বিপক্ষে ছিলেন। নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে পারস্পরিক মিলন আর বিরোধ যদি খোলামনে বিচার করে না দেখি, বিদ্বেষ এবং

সংঘাতকে যদি একটি বিশ্বাসের (set idea) দ্বারা চালিত হয়ে ব্যাখ্যা করি, তাহলে আমাদের ইতিহাস-বোধ বিকৃত হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেদিকেই সতর্ক করে দিয়েছেন : 'আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্মমূলক, সেই জন্যই আমাদের নিজেদের আজন্মকালীন সামাজিক সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস কুয়াশার মতো আমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সত্যকে নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে বাধা দিতেছে।...স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়।' (ভারত ইতিহাস চর্চা : ইতিহাস) কিন্তু দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমকালের ঐতিহাসিকরা—যেমন যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার - সাড়া দেন নি। আনন্দের কথা, সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিকরা যেমন ইরফান হাবিব, রমিলা থাপার, হরবনশ মুখিয়া, বিপান চন্দ্র প্রমুখ এই দৃষ্টিতে ইতিহাসকে পর্যালোচনা করছেন। বঙ্কিম স্বজাতিকে দেখেছেন—সর্বজাতিকে দেখেন নি; তিনি স্বধর্মের অনুরাগী ছিলেন—সর্বধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল না। যেটুকু হয়তো ছিল সেটুকুও তাঁর স্বধর্মের গণ্ডির বহির্ভূত ছিল না। সেজন্য কাজী আবদুল ওদুদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, 'সমগ্রভাবে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি মহান্ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না।' (বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ : শাশ্বত বঙ্গ, ১৩৮৮ সং, পৃ ২৩৮)।

উনিশ শতকের নবজাগরণের নায়করা সবাই ছিলেন হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত—কাজেই তাঁদের যাবতীয় কাজ বরাবর নিজস্ব সম্প্রদায়ের উন্নতিবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ সেদিন বাঙলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়। এই গরিষ্ঠ অংশের প্রতি সেদিনকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কোনো আবেগ ছিল না। আর ইংরেজ শাসকরাও মুসলমানদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। হিন্দুসম্প্রদায় ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল বলে হিন্দুদের প্রতি শাসকশ্রেণী সদয় ছিল। তারা ইংরেজি শিক্ষা সঙ্গে-সঙ্গে গ্রহণ করে রাজকার্যে বড়ো-বড়ো পদ পেতে লাগল এবং এই উঠতি সম্প্রদায়কে নিজেদের তাঁবেতে রাখার জন্য শাসকবর্গ প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিতে লাগল। মুসলমানরা ইংরেজদের চোখে প্রধান শত্রু ছিল, কারণ হৃতসাম্রাজ্য উদ্ধারের জন্য তারা ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে খণ্ড-বিখণ্ডভাবে যুদ্ধ করেছে। কাজেই, সে সময়কার ইংরেজ-লিখিত ইতিহাসে মুসলমানরা অবাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত ব্যক্তিরূপে চিত্রিত হয়েছে, আর ওইসব ইতিহাস যাঁরা পড়তেন তাঁরাও ইংরেজদের মতো মুসলমানদের ঘৃণা করতেন। ইংরেজরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু সভ্যতা নাম দিয়ে এদেশের শিক্ষিত হিন্দুজনের কাছে দেখাল যে সে-যুগে হিন্দুরা রাজনৈতিক আধ্যাত্মিক সবদিক দিয়েই উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, আর মধ্যযুগে ভারতে মুসলমানরা বাইরে থেকে এসে সবকিছু ভেঙে তছনছ করে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছে, আর অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ এসে মধ্যযুগীয় অন্ধকার সরিয়ে স্বৈরাচারী শাসন খতম করে আধুনিকতার দ্বারে ভারতীয়দের পৌঁছে দিয়েছে। ইংরেজরা যে আমাদের কত উপকারী বন্ধু, তা বঙ্কিম ভূদেব থেকে শুরু করে এযুগের যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখেরা ইংরেজ জেমস মিল-প্রবর্তিত ইতিহাস রচনাপদ্ধতির উপর দাগা বুলিয়েছেন। মুসলিম শাসনকে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বিদেশী শাসন বলে অভিহিত করেন, আমাদের ঐতিহাসিকরাও তাই নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাই মনে করতেন। তিনি কি কখনও চিন্তা করেছেন—যাঁদের আর্য বলা হত মুসলমানদের মতো তাঁরাও বিদেশী ছিলেন! আর্য ও মুসলমানরা এদেশকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন, দেশের টাকা দেশের উন্নতিতে ব্যয় করতেন আর ইংরেজরা

এদেশকে কখনও স্বদেশ বলে ভাবে নি—তারা এদেশের টাকা শোষণ করে বিলেতের উন্নতি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক ছিলেন, তখনকার দিনের পণ্ডিত ব্যক্তি—এই সহজ সাদামাঠা কথাটা কি তিনি বুঝতেন না? হয়তো বুঝতেন কিংবা বুঝতেন না। ইংরেজের চাকরি করতেন বলে হয়তো বুঝতে চাইতেন না। কিন্তু একটা জাত দীর্ঘ ছ-সাত শ বছর বাস করে এদেশকেই স্বদেশ বলে মেনে নিয়েছে, সুখে-দুখে আপদে-বিপদে পাশাপাশি বাস করেছে। ইংরেজের উচ্ছিষ্ট ইতিহাসকে মেনে নিয়ে মূলস্রোত থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যদি ইংরেজ শক্তিকে ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর নীতি বঙ্কিমের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে বলার কিছু নেই।

সচেতন দায়িত্ববোধ, সত্যানুগত্য ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বঙ্কিম তৎকালীন ইতিহাস পড়েন নি এবং তৎকালীন ঘটনাকে বিশ্লেষণও করেন নি। তাঁর সময়ের যেসব ইতিহাস ইংরেজ লেখকরা রচনা করেছিলেন তাকেই তিনি অবলম্বন করেছেন। এইসব ইতিহাস গালগল্পে ভরা এবং রচনাপদ্ধতির মধ্যে ছিল একটি বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। ইংরেজ শাসকরা শাসন- ও সমাজ-ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এনেছে তার মধ্যেও ছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে অপদস্থ করা এবং আর্থিক দিক দিয়ে পঙ্গু করে দেওয়া। শাসকের এই দৃষ্টিভঙ্গির সুযোগ নিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং শাসকরাও বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলমান-বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়েছে।

অনেকেই বলে থাকেন—বঙ্কিমচন্দ্র যে-মুসলমানকে গালাগাল দিয়েছেন তারা তুর্কী মুঘলশাসকগোষ্ঠী, তারা অত্যাচারী ছিল। কিন্তু এই গালাগালের মধ্যে সংযম থাকে নি, মাত্রার অতিরিক্ত হয়ে সমগ্র মুসলমান সমাজকে অপমানিত করেছে। যেমন "আনন্দমঠে" গ্রামের মুসলমান সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য। গ্রামের মুসলমানরা তো অত্যাচারী ছিল না, তারা বিদেশী নয়, পুরুষপরম্পরায় তারা এদেশের বাসিন্দা, তবু গালাগাল তারা খেয়েছে। ইংরেজ শাসনে হিন্দু-মুসলমানের ভাগ্য একসূত্রে যেখানে গাঁথা, সেখানে ঐক্যসাধনার উপর জোর দেবার কথা, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তা না করে বিভেদের মধ্যেই পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেলেন। তিনি তাঁর সমকালের য়ুরোপীয় নাস্তিক্য-দর্শন, মিল কোঁৎ বেন্থাম প্রমুখর মতবাদ, মার্কস-ডারউইনের মতবাদ, ফরাসি বিপ্লব, শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে পরিচিত হয়েও মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পন্থায় হিন্দু অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখতেন এবং হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হলে হিন্দুজাতির উন্নতি আর প্রতিষ্ঠা হবে—এরকম ধারণা পোষণ করতেন। অথচ বাঙলাদেশে মুসলমানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙলাদেশে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবাস্বপ্নের মতো অলীক—এ বোধ তাঁর হয় নি, তিনি হিন্দুর বাহুবল আর চরিত্রবলের ধ্যান করতেন। বাঙলাদেশে মুসলমানকে বাদ দিয়ে যে হিন্দুর স্বাধীনতা আনা যায় না, এই বাস্তববুদ্ধি তাঁর ছিল না। ইংরাজদের আগে মুসলমানরা এদেশের শাসনকর্তা ছিল—তারা শাসিতদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ হয়তো করেছে, কিন্তু কোনোক্ষেত্রেই বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করে নি। যদি তা করত তাহলে মুসলমান শাসক হিন্দুকে নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে একত্রে সংগ্রামও করত না। ১৮৬০ সাল পর্যন্ত এ চিত্র আমরা দেখেছি। বঙ্কিমচন্দ্র এই অখণ্ড জাতীয়তার প্রাচীরে প্রথমে ফাটল ধরালেন—তাঁর সাহিত্য শুধু মুসলমান-দের অবজ্ঞা করল না—উত্তেজনার সৃষ্টি করল, বিদ্বেষও প্রচার করল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করার বিপদ আছে, তা বঙ্কিমচন্দ্র ভালোভাবেই জানতেন। তিনি হিন্দুদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য পুরোনো শত্রু মুসলমানকেই বেছে নিলেন; সত্য-মিথ্যে মিশিয়ে ইতিহাসের ভেজাল দিয়ে অত্যাচার আর অমানুষিকতার চিত্র অঙ্কিত করে হিন্দুদের উত্তেজিত করে তুললেন। হিন্দু মনে মুসলিম-বিদ্বেষের সাথে-সাথে স্বজাতি স্বদেশ-প্রেমের মধ্য দিয়ে জাতি

হিসেবে তারা গঠিত হতে লাগল। বিপরীত দিকে, মুসলমানের মন ভেঙে গেল, শিক্ষিত মুসলমানরা এবংবিধ চরিত্রচিত্রণে এবং উগ্র জাতীয়তাবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সাহিত্যে একদিকে এই চিত্র, অপরদিকে তারা আর্থিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাচ্ছিল এবং হিন্দু জমিদারদের দ্বারা শোষিত হচ্ছিল। ফলে, বঙ্কিমকে হিন্দু মানসের প্রতীক ধরে উদ্বেজিত হয়ে ওঠে। পরিণামে, বাঙলাদেশে মুসলিম লীগ শক্ত ঘাঁটি করে ফেলল, দাঙ্গা হল, শেষ পর্যন্ত হানাহানির মধ্য দিয়ে দেশ ভাগ হল, আর স্বাধীনতাও এল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্রকে মোটেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলা চলে না। দেশবিভাগের জন্য তাঁর দায়দায়িত্বও কম নয়।

শাসকশ্রেণী মুসলমান সম্প্রদায়কে আর্থিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত করার জন্য ভূমি- ও রাজস্ব-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে। ফলে মুসলমান অভিজাত-শ্রেণী এবং তার ওপর নির্ভরশীল জনসমাজ ধীরে-ধীরে দারিদ্র্যসীমায় নেমে যেতে থাকে আর হিন্দু ফড়ে-দালাল-বেনিয়া-মুৎসুদ্দিরা ধীরে-ধীরে উপরে উঠে আসে। অজ্ঞানতার অন্ধকারে মুসলমান সমাজ নিমজ্জিত হল আর জ্ঞানের আলোয় হিন্দুসমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার আশা নিয়ে এগিয়ে গেল। এইভাবে হিন্দু মধ্যবিত্ত আর ভূস্বামী-শ্রেণী গড়ে ওঠে। মেকলে যে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক। এই নগরকেন্দ্রিক শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ হিন্দুদের পক্ষে গ্রহণ করা যত সুবিধাজনক ছিল মুসলমানদের পক্ষে তত সহজ ছিল না। কারণ, তারা আর্থিক দিক দিয়ে হটতে-হটতে গ্রামে পৌঁছে গেছে। শহরে বাস করার মতো বিত্ত তারা তখন হারিয়ে ফেলেছে। বাঙলায় মুসলমান সমাজ যখন সব দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ল, তখন তাদের বাঙালি বলে মানতেও হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বিধা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এরকম একটা ধারণা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তৈরি করে দিয়েছিলেন যার জের বিশ শতকেও এসে ক্ষান্ত হয় নি। শরৎচন্দ্র "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রথম পৃষ্ঠাতেই স্কুলের ফুটবল ম্যাচের বর্ণনায় বাঙালি বলতে হিন্দুকে বুঝিয়েছেন। এই মনোভাব কী করে তৈরি হয়েছিল? তার শিকড় পাওয়া যাবে উনিশ শতকের তথাকথিত জাগরণের মধ্যে। সামাজিক ও সাহিত্যের ইতিহাস এমনভাবে রচিত হয়েছিল যার ফলে জিন্নার দুজাতিতত্ত্বের বীজ উনিশ শতকেই পোঁতা হয়েছিল।

উনিশ শতকের হিন্দুসমাজে উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর। হিন্দুসমাজের কুসংস্কার দূর করা এবং শিক্ষাবিস্তারে তাঁদের প্রয়াস হিন্দুসমাজের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও তাঁরা মুসলমান-বিদ্বেষ প্রচার করেন নি। মুসলমানদের সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেন নি আর তাঁদের প্রভাব মুসলমান সমাজকে প্রভাবিতও করে নি। কারণ স্বামীর সহ-মরণে স্ত্রীর আত্মাহুতি ইসলামে নেই আর বিধবাবিবাহ ইসলামে পূর্ব থেকেই রয়েছে।

সে যুগে সরাসরি ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দৃষ্টান্ত যেমন ছিল, তেমন সাহিত্যেও তার কিছু-কিছু রূপায়ণের চিত্রও ছিল। সিপাহি বিদ্রোহ যখন চলেছে তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্তের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন। তাঁরা কেউই এই বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি, অথচ বাঙলাদেশে তখন দ্রুতগতিতে সমাজ- ও ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন চলছে। বাঙালির এই-জাতীয় আচরণে সিপাহিরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং বাঙলার বাইরে যে বাঙালিরা বসবাস করেছে তাদের ঘৃণা করেছে, এমন-কী বেত্রাঘাতও করেছে। একমাত্র বাঙালি হিসেবে দৈনিক সমাচার "সুধাবর্ষণ"-এর সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেন বিপ্লবী সিপাহিদের সমর্থন করেছিলেন বলে ইংরেজের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। নীলকর চাষিদের উপর যখন অত্যাচার হয়েছে তখন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাদের পক্ষে ছিলেন। দীনবন্ধু সরকারি পোস্টমাস্টার হয়েও "নীলদর্পণ" (১৮৬০) নাটক লিখেছিলেন এবং রঙ্গমঞ্চে সেটি অভিনীতও হয়েছিল। বড়ো সাহেবের সবুট পদাঘাত নীরবে হজম করে নি নবীনমাধব—লাথির বদলে সাহেবের বুকে লাথি সে মেরেছে। ক্ষেত্রমণির উপর পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে চাষির ছেলে তোরাপ রোগ সাহেবকে মেরে। উপেন্দ্রনাথ দাসের "শরৎসরোজিনী" (১৮৭৪) নাটকে শরৎ প্রকাশ্য রাজপথে গোরা সার্জেনটকে বেদম মেরেছে। এই নাটকে কয়েদিরা জোটবদ্ধ হয়ে ইংরেজের জেল ভেঙেছে এবং অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করেছে। এইরকম সাহসিকতার চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র কোনো উপন্যাসে দেখাতে পারেন নি।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বাঙলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য শিল্প-রীতির অনুসরণে "দুর্গেশনন্দিনী" (১৮৬৫) উপন্যাসে যে শিল্পকর্মের সূত্রপাত করলেন, সেটিই ছিল বাঙলা উপন্যাসের প্রধান সড়ক। তাঁর তৈরি এই সড়ক বহুজনসমাগমে পরিপূর্ণ হয়েছে। বাঙালি পাঠক খুশি মনে পড়েছে, বাঙালি লেখক তাঁর উপন্যাসের শিল্প-কর্মকে আদর্শ করে সামনে রেখেছে। "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে ওসমান জগৎসিংহকে বলছে, 'মুসলমানদের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্মই সত্যধর্ম। বলে হউক, ছলে হউক, সত্যধর্ম প্রচারে আমাদের মতে অধর্ম নাই, ধর্ম আছে।' বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব ধর্ম সম্পর্কে যতটা জানতেন অপর ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা ততটাই ছিল—নইলে এরকম উক্তি ওসমানের মুখে বসাতেন না। তবু ওসমানকে মহৎ চরিত্রে পরিণত করতে ত্রুটি করেন নি—ওসমানকে পাঠানকুলতিলকরূপে তিনি অঙ্কিত করেছেন আর আয়েষা রমণীরত্ন। যেসকল গুণে নারী সকলকে মুগ্ধ করে বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষার মধ্যে তার কিছুরই অভাব রাখেন নি। "কপালকুণ্ডলা" (১৮৬৬) বঙ্কিমের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস—কী চরিত্রচিত্রণে, কী পরিকল্পনায়, কী ভাষায়, কী চিত্রবিশ্লেষণে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই উপন্যাসে মেহেরউন্নিসা ও মতিবিবির হৃদয়দ্বন্দ্বমুখর চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি বাঙলা উপন্যাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। এরপর থেকেই শিল্পী বঙ্কিম ক্রমশ সরে যেতে থাকেন—মতবাদী-বঙ্কিম শিল্পী-বঙ্কিমের ঘাড়ে চেপে বসেন। সেজন্য ড. আহমদ শরীফ বলেছেন, 'সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটে সংস্কারমুক্ত জিজ্ঞাসু মানুষ হিসাবে এবং তাঁর তিরোভাব ঘটে একজন খাঁটি হিন্দু হিসাবে। অতএব বঙ্কিম-সাহিত্য হচ্ছে মানুষ বঙ্কিমের হিন্দু বঙ্কিমে ক্রমপরিণতির ইতিকথা ও আলেখ্য' (বঙ্কিমসমীক্ষা: অন্য নিরিখে)। শিল্পী বঙ্কিমের থেকে হিন্দু বঙ্কিমের হিন্দুরাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়—"মৃণালিনী" (১৮৬৯) উপন্যাসে তার প্রথম সূচনা। "বিষবৃক্ষ" (১৮৭৩), "চন্দ্রশেখর" (১৮৭৫), "কৃষ্ণকান্তের উইল" (১৮৭৮)-এ সংস্কারক বঙ্কিমের পরিচয় থাকলেও তাঁর শিল্পদৃষ্টি তখনও ক্ষুণ্ন হয় নি।

ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়ে উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন, এখান থেকেই বিপদের সূত্রপাত শুরু হল। "রাজসিংহ" (১৮৮২), "আনন্দমঠ" (১৮৮৪), "দেবী চৌধুরাণী" (১৮৮৪), "সীতারাম" (১৮৮৭) লিখলেন। এই উপন্যাসগুলিতে বিশেষ করে "রাজসিংহ" আর "আনন্দমঠ"-এ মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গিরণ করতে আরম্ভ করেন। মুসলমান সমাজকে হীন বলে প্রতিপন্ন করে "যবন", "নেড়ে" শব্দ ব্যবহার করে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐক্যস্রোত থেকে মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তা করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসকে অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত করেছেন। রাজপুত তথা হিন্দুর সঙ্গে মুঘল তথা মুসলমানদের সংঘর্ষ সৃষ্টির মধ্যে হিন্দুর বীরত্ব আর শ্রেষ্ঠত্ব তিনি দেখিয়েছেন। মুঘলশক্তিকে যদি তিনি সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হিসেবে দেখতে চান, তাহলে মুঘলদের বিরুদ্ধে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত

যুদ্ধের কথা তিনি তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু কেন করলেন না—এ প্রশ্ন সঙ্গতরূপেই উদিত হতে পারে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য তা ছিল না—তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুর শৌর্য প্রকাশ করা। "রাজসিংহ" উপন্যাসের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন-কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাস লেখক সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। ...উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনা-প্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।' এখানেই তিনি বিপদ ঘটিয়েছেন, এই ভেজালটাই মারাত্মক হয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করছেন, তাঁদের আমরা হিরো করে দিয়েছি, অথচ তাঁরাও প্রজাদের ওপর কম অত্যাচার করেন নি, শোষণও কম করেন নি। ইতিহাসের সত্যকে অনেক সময় নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিকৃত করা হয়—এই বিকৃত সত্য মিথ্যা থেকে ভয়ঙ্কর। গৌতম নিয়োগী এই মারাত্মক দিকটি সম্পর্কে বলেছেন, 'ইতিহাসের পছন্দমতন ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করেই কিন্তু গড়ে উঠেছে এক শ্রেণীর সাহিত্য, বিশেষত উপন্যাস এবং নাটক, যা কাউকে অযথা খাটো বা অকারণে মহৎ করে সৃষ্টি করেছে, ফলে দীর্ঘদিন ধরে লোকের মনে শৈশবাবধি অনেক অনৈতিহাসিক ধারণা ঢুকে গেছে।' (প্রসঙ্গ : সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতের ইতিহাস। ইতিহাসচর্চা জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ১৯৮৫, পৃ ১০৩) "রাজসিংহ" উপন্যাস তার প্রমাণ। হিন্দু-মুসলমানের বৈরীভাব তৈরি করতে গিয়ে ঔরঙ্গজেবকেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত দায়ী করেছেন। ঔরঙ্গজেবের যে ঐতিহাসিক চর্চা সেসময় উদ্ঘাটিত হয়েছিল তাকেই সত্য-মিথ্যের মিশেল দিয়ে তিনি তাঁকে শঠচরিত্রে রূপায়িত করেছেন। ঔরঙ্গজেব সাম্প্রদায়িক ছিলেন, গোঁড়া ছিলেন, জিজিয়া কর আদায় করতেন, হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করতেন ইত্যাদি নানা অভিযোগ এনে তাঁকে এক পাষণ্ড চরিত্র হিসাবে অঙ্কিত করা হয়েছে। ঔরঙ্গজেব কি এদিক দিয়ে একক উদাহরণ ছিলেন? বহু হিন্দুরাজাও মন্দির ধ্বংস করেছেন। পারমার রাজা সুভাত বর্মণ (১১৯৩-১২১০) গুজরাত আক্রমণ করে দাভয় ও ক্যাম্বে অঞ্চলে বহু জৈন মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। কাশ্মীরের রাজা হর্ষ হিন্দুমন্দির লুণ্ঠন করে নিজের রাজভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। মন্দিরধ্বংসের কারণ হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নয়, প্রধান কারণ অর্থ-নৈতিক। মন্দিরে ধনরত্ন প্রচুর থাকত—এই লোভেই মন্দিরনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান নরপতিরা লুণ্ঠন করতেন। তা ছাড়া, মন্দিরে যদি শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার খবর পাওয়া যেত, অনেক নরপতি মন্দির ধ্বংস করে দিতেন। শিবাজীর পৌত্র শাহু আর তাঁর মা মুঘলদের হাতে বন্দী হলে তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে হিন্দুদের বিধিনিষেধ স্বয়ং ঔরঙ্গজেব নিজে তত্ত্বাবধান করতেন। হিন্দুমন্দিরনির্মাণে বা সংস্কারে অর্থ সাহায্য করতেন, মন্দিরনির্মাণে বহু জমি তিনি দান করেছেন। হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর বসানোর কথা আমরা জানি, কিন্তু আমরা কজনা জানি দক্ষিণ ভারতের হিন্দু-রাজবংশ জামোরিন ইহুদি প্রজাদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' আদায় করতেন? আমরা কি জানি জিজিয়ার আওতা থেকে নারী, শিশু, পঙ্গু, ব্রাহ্মণ ও সৈন্যরা বাদ পড়তেন? ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান শাসকরা তাঁদের মুসলমান প্রজাদের ওপরও জিজিয়া কর বসাতেন এবং ভারতে মুসলমান প্রজাদের ওপর "জাকাত" কর বসানো হত। যদুনাথ সরকার "রাজসিংহ" উপন্যাসে অনৈতিহাসিক ঘটনার কথা স্বীকার করেও তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন এবং ধর্মান্ধতার দ্বারা লেশমাত্র প্রণোদিত হয় নাই, একথাও বলেছেন। যদুনাথ সরকারের একথা মানা যায় না; কারণ তিনি যাকে গৌণবিচ্যুতি বলেছেন সেগুলি আদৌ গৌণ নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মোটিভ সেখানে কাজ করেছে। যদুনাথ সরকার যেমন দেখেন নি,

তেমনি বঙ্কিম-অনুরাগী সমালোচকরাও দেখেন নি। ঔরঙ্গজেবের প্রধান মহিষী যোধপুরী বেগম মূর্তি-পূজা করতেন তা ঐতিহাসিক সত্য নয়, রোসনেরা জেবউন্নিসা প্রেমের ব্যাপারে পরস্পরের প্রতিযোগিনী ছিলেন ইতিহাস তা সাক্ষ্য দেয় না, উপন্যাসের শেষার্ধে রাজপুতদের হাতে ঔরঙ্গজেবের লাঞ্ছনা ইতিহাস স্বীকার করে না; জেবউন্নিসার মতো একজন বিদুষী মহিলার মুঘল হারেমের স্বভাব অনুযায়ী চরিত্র অঙ্কন—ইতিহাস তাও বলে না। যদুনাথ সরকার এইসব বিষয়কে গৌণ বলেছেন আর বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন, 'উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।' হিন্দুদের বাহুবলই তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল বলে "রাজসিংহ" উপন্যাসকে তিনি বারে-বারে পরিবর্ধন পরিমার্জন করেছেন। প্রথম তিনটি সংস্করণে জেবউন্নিসা নেই, জেবউন্নিসা-মবারকের প্রণয়কাহিনী নেই, দরিয়া নেই, দরিয়া-মবারকের প্রেমকাহিনী নেই। যদুনাথ সরকার বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক কাঠামোটা ঠিক রেখেছেন উপন্যাসের প্রয়োজনে, যেসব ঘটনার এদিক ওদিক করেছেন সেসব গৌণ ব্যাপার। মুনীর চৌধুরী এর জবাব দিয়েছেন তাঁরভাষায়—'মুখ্য গৌণের এই ভেদতত্ত্বের মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম স্থূল বঞ্চনা আছে তা অমুসলমান পাঠক-সমালোচকরা কেবল নিজেদের বদ্ধমূল সংস্কারের জন্যই দেখেও দেখতে পান নি। .....কুশলী শিল্পী লাঠি না ভেঙেও সাপ মারতে পারেন।.....'রাজসিংহ" মুসলিম পাঠকের মনে যে-যে কারণে তিক্ততা সৃষ্টি করে সেগুলো তার মতে অবহেলা করবার মতো। যদি সে অবহেলা করতে পারত, তবে তার মনে তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারত না। তখন ঐ সামান্য বস্তুসমূহ ঐতিহাসিক না অনৈতিহাসিক সে প্রশ্নও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হত না।' (তুলনামূলক সমালোচনা, পৃ ২৮, ৩০, ১৯৬৯ সং) বঙ্কিমচন্দ্রের মোটিভটাই ছিল উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবোধ জাগানো, কাজেই ইতিহাসের ধার তিনি ধারেন নি—কারণ অকারণে একটা জাতিকে অপমানিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 'ভারতকলঙ্ক" নামক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বললেন, 'আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ-লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ-লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই মঙ্গল।' মানুষ বলতে তিনি বুঝেছেন হিন্দু, ধর্ম বলতে বুঝেছেন হিন্দুধর্ম। বঙ্কিমজীবনীকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায় তিনি শুধু হিন্দু নন, তিনি হিন্দুধর্মের নেতা ছিলেন। তাই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "ভারতে জাতীয় আন্দোলন" গ্রন্থে বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হিন্দু জাতীয়তার কথা জাগিতেছিল, সেই জন্যই তিনি মুসলমানের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। তাঁহার দেখার মধ্যে জাতীয় ভাবের অপেক্ষা হিন্দু জাতীয়তার ভাব বেশি ফুটিয়াছে। সেইজন্য তিনি হিন্দুদের নিকট অধিক প্রিয় হইয়াছেন এবং দেশে হিন্দু জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন।' (পৃ ৩৮, ১৯২৫ সং)।

উপন্যাসের প্রথম থেকেই তিনি অশোভন রুচির পরিচয় দিয়েছেন ঔরঙ্গজেবের ছবির ওপর পদাঘাত করে। চঞ্চলকুমারী ঔরঙ্গজেবের ছবিটি নিয়ে বলছে, 'আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি। সবাই উহার মুখে এক একটি বাঁ পায়ের লাথি মার। কার লাথিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি। ...কেহ অগ্রসর হইল না।...চঞ্চলকুমারী ধীরে-ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন—মড়-মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্তি রাজপুত-কুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।' রুশ জাতির শত্রু ছিলেন নেপোলিয়ন—তলস্তয় "ওয়র অ্যানড পীস" গ্রন্থে এরকম চিত্র অঙ্কনের কথা ভাবতেই পারেন নি। হিটলার লক্ষ-লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছে, তার চিত্রের ওপর লাথি মারার কল্পনা কোনো ইহুদি-

লেখকও করেন নি। ড. কাজী আবদুল মান্নানের কথায় বলা যায়, 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতীক হিসাবে কোনো একজন রাজা-বাদশার 'তসবির' আর-এক রাজার কন্যা পদদলিত করছে, এটা ঘটা করে অঙ্কন করার মধ্যে ঔপন্যাসিকের কুৎসিত রুচির পরিচয় ছাড়া অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য "সিদ্ধি" হয় না' (রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ ২৬)। বঙ্কিমের বোঝা উচিত ছিল শাসকের কোনো জাত থাকে না, নিজের কর্তৃত্বরক্ষার জন্য সে সবকিছু করতে পারে। ধর্ম এক থাকা সত্ত্বেও মুঘল-পাঠানে যুদ্ধ হয়েছে, রাজত্ব বাঁচাবার জন্য মুঘল-রাজপুতে যুদ্ধ হয়েছে। ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বঙ্কিমসৃষ্ট ঔরঙ্গজেব চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'ঔরংজেব অনুদার ও 'ধর্মশূন্য' হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও ক্ষমতার অভাব ছিল না, বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার মতো ক্ষমতাশালী নৃপতি খুব কমই দেখা যায়।··· বঙ্কিমচন্দ্র আঁকিয়াছেন এক স্ত্রীবুদ্ধি-চালিত, শিথিল-শাসন, অক্ষম, কামুক কাপুরুষ চরিত্র।···ঔরংজেব অতিশয় মিতাচারী ছিলেন। তিনি চারবার বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চার বেগম কখনও এক সময়ে একসঙ্গে তাঁহার কাছে থাকে নাই।···এই উপন্যাসে দেখি নির্মলকুমারী ঔরংজেবকে যত অপমানই করুক বাদশাহ্ তাহার 'বন্দীভূত' হইয়াছেন। ঔরংজেব কখনও কোন নারীর কটাক্ষে মোহিত হইয়া তাহার দ্বারা চালিত হইবেন, ইহা উপন্যাসেও বিশ্বাস করা শক্ত' (বঙ্কিম, ২য় সং, পৃ ১৬৯-১৭০)। কাহিনী শেষ হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানের পিঠ থাবড়িয়ে যা বলেছেন তা গোরু মেরে জুতো দানের সমতুল্য। তিনি বলেছেন, 'কোনো পাঠক না মনে করেন যে হিন্দুমুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে।' ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করার জন্য সমালোচকরা "রাজসিংহের"র উপসংহারে গ্রন্থকারের নিবেদন অংশ উদ্ধৃত করে থাকেন কিন্তু রাজসিংহ-এর মুখপাতে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুদের বাহুবল প্রদর্শনের জন্য ইতিহাসকে সরিয়ে ইচ্ছামতো কল্পনার আশ্রয়ও নিতে পারেন ফলে যেসব ধারণা ও অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে তা মুসলমানদের পক্ষে প্রীতিকর হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িকতার অপবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য যেসব সমালোচকরা ধানাইপানাই করেন, মুনীর চৌধুরী তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'এগুলোর উৎস ইতিহাস নয়, উৎস ব্যক্তি; জ্ঞান নয়, মানসিকতা। হালের সমালোচকরা বঙ্কিমকে রক্ষা করবার জন্য অযথা ইতিহাসের নামে নানা যুক্তির অবতারণা করেন। বঙ্কিম নিজে কখনও এ-বিষয়ে কোনো অপরাধ অনুভব করেন নি। করলে চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য এত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করতে পারতেন না: 'হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতি-পাদ্য' (তুলনামূলক সমালোচনা, পৃ ৩০)।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

দ্বিতীয় পরিচয়

মীনাক্ষী ঘোষ

এতদিন তো অচেনাদের সাথেই পরিচয় করতে শিখেছে সুজয়, সে ব্যাপারে বেশ দক্ষতাও দেখিয়েছে; কিন্তু আজ যখন তিরিশ বছরের পুরাতনী নতুন পরিচয়ের দাবি জানাল, তখন সুজয় মনে-মনে যথার্থ প্রমাদ গুনল। অসহায়ভাবে সে তড়পাতে লাগল: নিজের বাড়িতে আবার নিজেকেই নতুন করে অ্যাডজাসট করতে হবে, একথাটা আগে জানলে শালা কে করত বিয়ে।

এতদিন তো শুনে এসেছে যত দুঃখু নাকি মেয়েদেরই কপালে। সাতজন্ম পাপ করলে মেয়ে হয়ে জন্মায়। সুজয়ের তো মনে হয়—তার চোদ্দ জন্ম পাপ ছিল। অথচ দেখো—শরৎবাবু থেকে আশাপূর্ণা দেবী—সর্বকালের তাবৎ লেখক-লেখিকার কলম মেয়েলোকের চোখের জলে থই-থই। বিয়ের পর শ্বশুর-ঘরে এসে মেয়েদের নাকি হাড়ির হাল; কিন্তু বিয়ের পর পুরুষমানুষ নিজের ঘরে বসেই যে ত্রিভুবন দর্শন করে সে খবরে, কী লেখক, কী সমাজসংস্কারক—কারুর কোনো মাথাব্যথাই নেই। বিয়ে হলে মেয়েদের বাপের কুল ছাড়তে হয় বটে, কিন্তু পুরুষকে যে দুকূলই খোয়াতে হয়।

মেয়েগুলোর দুঃখ হল কী—বাপের বাড়িতে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচিয়ে শ্বশুরবাড়ির নিন্দে, ব্যাস কুকারের একস্ট্রা প্রেসার রিলিজড্। আর আমাদের জন্য কারুর সহানুভূতি নেই। না বাপ-মা, না শ্বশুর-শাশুড়ি। থাক শালা নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আর গেল্ মা-বউ-শাশুড়ি—সকলের যত বিষ। একফোঁটা চোখের জলও ফেলার জো নেই—তুমি না পুরুষসিংহ!

বউয়ের ঠোঁটে সব সময় অভিমান—'তোমায় বিয়ে করে জীবনটা নষ্ট হল।'

শ্বশুর-শাশুড়ির চোখে সব সময় অভিযোগ:

'বড়ো যত্নে মানুষ করেছি, বাবাজীবন, মেয়েটিকে, ওর কষ্ট তো তোমাকেই দেখতে হবে এখন।' তারা না হয় পরের বাড়ির, কিন্তু নিজের বাড়ির একান্ত আপনজনের ভিতর কোথায় লুকানো ছিল

এমন ধারালো বেয়োনেট, সুজয় তো বিয়ের আগে মোটেই টের পায় নি। সব সময় তীক্ষ্ণভাবে ছুটে এসে হৃৎপিণ্ড ফালা-ফালা করে দেয় সুজয়ের।

—'বিয়ে করে পর হয়ে গেছিস।' হায়, এত কষ্ট, কিন্তু একটা লেখক পর্যন্ত একটু সহানুভূতি জানিয়ে দুকলম লিখতে চান না।

আশ্চর্য! সুজয় ভাবে, এই একটা মাস আগেও পৃথিবীর সবরকম আঘাত থেকে ছেলেকে আড়াল করবার জন্য সুমনা বুক পেতে থাকতেন। সুজয়ের একবিন্দু সুখের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি।

সুজয়ের খাবার দেরি হয়ে যাবে বলে সুমনা কোনোদিন ইভনিং শো-এ সিনেমা দেখেন নি। সুজয় খেতে ভালোবাসে বলে প্রৌঢ় বয়সে রান্নার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন সুমনা। কতবার সুজয় মাকে বলেছে, —'এত পরিশ্রম কর কেন মা আমার জন্য?'

সুমনা সস্নেহে বলেছেন, —'তোর সুখই আমার সুখ রে।'

বাস্তবিক, নিজের যেন কোনো অস্তিত্বই ছিল না সুমনার। সুজয়ের ভালো মানেই তাঁর ভালো। মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় চিরকাল নত হয়ে থেকেছে সুজয়। কতবার গর্বে আনন্দে সাতহাত বুক নিয়ে মায়ের গল্প করেছে সে নন্দিতার কাছে, —'বিয়ে হলে দেখবে আমার মায়ের মতো মা দুনিয়ায় দুর্লভ। মা আমার দেবী-মা।'

সেই দেবী সুমনার চালচিত্র ছিঁড়ে-খুঁড়ে হাড়-মাংসের মানবী বের হয়ে পড়ল নতুন বউয়ের গায়ের হলুদ ছোপটুকু উঠবার আগেই।

সুজয় ভোরে উঠতে ভালোবাসে না বলে ঠিকে ঝিয়ের ভোরবেলা ঢোকা বারণ; বাসন মাজার আওয়াজে পাছে সুজয়ের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। বেলা আটটার আগে এ-বাড়িতে কেউ টি. ভি. কিংবা রেডিও খুলতে পারে না। সুমনার কড়া হুকুম। আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি কত অভিযোগ ছিল তাঁর, —'আহা, আমার সুজয় ঘুমিয়ে আছে, তোমরা একটু আস্তে কথাও কইতে পার না?'

সেই সুমনা ফুলশয্যার রাত না পোহাতে দরজায় দুম-দুম কিল মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, —'পাঁচটার ভোঁ বাজল, শুনিস নি নাকি তোরা? এত বেলা অবধি শুয়ে থাকলে আত্মীয় পরিজন বলবে কী? বেহায়া কোথাকার।'

মায়ের গলার তীক্ষ্ণতায় চমকে ওঠে সুজয়। এ কার স্বর? সুজয়ের সাথে এর পরিচয় নেই। নন্দিতার কাছে তো এ বাড়ির সবই নতুন। নতুনের সাথে পরিচয় করবার জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়েই থাকে। কিন্তু পুরানোর সাথে পরিচয় করবার জন্য সুজয় যে একেবারেই প্রস্তুত নয়।

— নন্দিতা, ভাগ্যিস তুমি পুরুষ নও।

একবুক-ভালোবাসা-ভরা আত্মত্যাগে মহীয়সী তিরিশ বছরের চেনা মাকে হঠাৎ করে বিয়ের হাটে হারিয়ে ফেলে সুজয় যেন এক-সমুদ্দুর অসহায়তার মধ্যে আনাড়ি অস্তিত্ব নিয়ে খাবি খেতে লাগল।

বেশ কয়েকটা মাস জোড়াতাড়া দিয়ে ব্যানডেজ বেঁধে পার করল সুজয়। কবে যে সুস্থ দিনের সাথে দেখা হবে কে জানে।

সন্ধেটায় আজ মা বাড়িতে নেই, বান্ধবীর বাড়ি গেছেন। সুজয় ভাবল নন্দিতার সাথে বেশ জমিয়ে গল্প করা যাবে। কিন্তু আজকাল নন্দিতার গল্প মানেই শাশুড়ি-বৃত্তান্ত। হাসিমজা—সব ভুলে গেছে নন্দিতা। কথা মানেই শুধু কান্না আর অভিযোগ। ধুত্তরি, জীবনে ঘেন্না। চুপচাপ মায়ের নিন্দা শুনে যাচ্ছিল সুজয়, ঘড়িতে ঢং ঢং করে নটা বাজতেই চমকে উঠল। মা এখনও ফিরলেন না কেন? নন্দিতা জানাল, —'কী জানি।' পাঁচটায় সুমনা ফেরেন নি দেখে দুজনে অবশ্য খুশিই হয়েছিল। অফিস ছুটির পর একটু একান্ত হবার সুযোগ তারা পায়ই বা কোথায়? কিন্তু তা বলে নটা অবধি আহ্লাদ জিইয়ে রাখা যায় না, উদ্বেগ এসেই পড়ে।

ক্রমে রাত বাড়তে থাকে, সেই সাথে দুটি প্রাণীর উৎকণ্ঠাও। তবে কি কোনো বিপদ হল? রাস্তায় যে ট্রাফিক। বারে-বারে গলা শুকিয়ে উঠতে থাকে সুজয়ের।

—জল দাও তো এক গ্লাস।

—আর কতবার জল খাবে? খুঁজতে বেরোও না।

—কার বাড়ি বলে যান নি তো। কোথায় খুঁজি?

জল্পনা-কল্পনায় রাত সাড়ে নটা। তবুও কলিং বেল নিঃশব্দ। অবশেষে দশটার ঢং ঢং। অগত্যা জামা জুতো গলাতে লাগল সুজয়।

—মানিব্যাগটা দাও তো।

ব্যাগটা নেবার সময় সুজয় দেখল নন্দিতার হাত কাঁপছে। আর সেই সময় কলিং বেল। নন্দিতা সুজয় দুজনে একসঙ্গে দৌড়ে হোঁচট খেয়ে দরজার কাছে। কে জানে কী সংবাদ অপেক্ষা করে আছে দরজার ওপারে।

সুমনা পরম নিশ্চিন্তে পান চিবুতে-চিবুতে দুটি আতঙ্কের ঝড়ে বিধ্বস্ত প্রাণীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জুতোর র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং ব্যাগটি রাখলেন ঠিক জায়গামতো।

—এত রাত অবধি কোথায় ছিলে, মা?

—অ। তোর বৌয়ের বুঝি খেতে শুতে দেরি হয়ে গেল? তা বাছা, তোমরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেই পারতে। মা আর কে? আমার জন্য তোমাদের দেরি করবার দরকারটাই বা কী?

—ও মা। থামো।

—তা বটে। মায়ের তো এখন থামবারই দিন। বউ পেয়েছ, তার মুখে এখন মধু। মা হল গে···।

সুজয় আর শুনতে পারে না, দৌড়ে চলে যায় অন্য ঘরে। হৃৎপিণ্ডে বিছের কামড়। এ মাকে সে চেনে না। এর সাথে চেনা করে নিতে হবে।

২

অফিসে বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। নন্দিতাকে বলার জন্য মনটা অস্থির। অতএব সুজয় অফিস থেকে ফিরে সোজা নন্দিতার ঘরে দৌড়ায়। কিন্তু গল্প দু কদম এগিয়েই ডিরেল্ড হয়ে পড়ে গেল। মায়ের ঘর থেকে ভেসে এল, —উঃ মাগো। মরে গেলাম।

সুজয় উৎকণ্ঠা নিয়ে ছুটল মায়ের ঘরে। পিছনে নন্দিতাও। তার কাঁচুমাচু জবাব শোনা গেল—

—মা তো চারটের সময় চা খেলেন। কই, শরীর খারাপ বলেন নি তো।

বিছানায় মায়ের ছটফটানি। সুজয় বলল,

—কী হয়েছে, মা?

—আর মা। মায়ের খবর নেবার আর কি তোমার সময় আছে বাছা? কী বশীকরণই জানে বউ; দুদিনেই এমন ভ্যাড়া বানিয়েছে যে অপিস থেকে এসেই ছেলে সেঁদিয়ে যায় বউয়ের আঁচলে।

—মা, তোমার শরীর খারাপ?

—শরীরের আর দোষ কী, বাবা? সংসারে সারাদিন দাসী-বাঁদীর বাড়া খাটুনি। বেলা পড়লেই পা দুখানা যন্ত্রণায় টনটন করে।

এইবার সুজয় খেঁকিয়ে ওঠে নন্দিতাকেই—তুমি কর কী সারাদিন? মায়ের কাজে একটু সাহায্যও করতে পার না?

অভিমানিনী নন্দিতা একটুও প্রতিবাদ করে না, কেবল রাগে দুঃখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

—ওঃ, অফিস থেকে ফেরা মাত্র যত অশান্তি।

—হ্যাঁ, যত অশান্তির কারণ তো আমি। পাঠিয়ে দে কোনো আশ্রমে আমায়। মরণও হয় না যে কেন আমার?

নন্দিতার চোখের জলে উইকেট পড়ে যাচ্ছে দেখে বউয়ের থেকে শতগুণ জোরে কাঁদতে থাকেন শাশুড়ি। সুজয় কিনা পুরুষমানুষ, তার তো কাঁদতে নেই। সে শুধু ভাবতে থাকে—এই কি তার এতকালের পুরানো বাড়িটা, বিকেল পাঁচটা বাজলেই যে সদর দরজার বুক হাট করে খুলে দুই হাত মেলে ডাকত—'আয়!

আয়!'

৩

অনেকদিন ধরে সুজয় প্ল্যান করছে, শনি-রবির ছুটির ফাঁকে নন্দিতাকে নিয়ে উধাও হবে কাছেপিঠের কোনো বুনো ডাকবাঙলোয়। কিন্তু আশ্চর্য, উইক এনড ঘনালেই সুমনার শরীর খারাপ হয়। অথচ সুজয়ের বিয়ের আগে সুমনার যেন লোহার শরীর ছিল। সুজয়ের যদি বা অসুখ করেছে, সুমনার কখনও নয়। কী হয়েছে মায়ের? ডাক্তার টনিক লেগেই আছে। মা কি আর কখনও ভালো হবেন না। মা ভালো না থাকলে সুজয় ভালো থাকবে কেমন করে?

এখন সুজয় হো-হো করে হাসতে ভয় পায়, পাছে সুমনা বলে বসেন,—বউ পেয়ে তো দেখি আহ্লাদে আটখানা।

এখন সুজয় সাবধানে থাকে যাতে কখনও খুব বেশি গম্ভীর না দেখায় তাকে। তাহলেই মা বলেন, —অমন গোমড়া কেন রে? বউ বুঝি কানে বিষ ঢেলেছে, তাকে আমি বড্ড খাটাই!

তার নিজেরই বাড়িতে প্রতিটি কথা চিন্তা করে মেপে বলতে গিয়ে সুজয়ের প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। তবু কি প্রলয় ঠেকানো যায়? ছেলের সুখেই যে মা একদিন আত্মহারা ছিলেন, এখন সেই ছেলেকেই প্রতিপদে কী করে যে এত কষ্ট দিচ্ছেন মা, সুজয় বুঝেই উঠতে পারে না।

ক্রমশ নন্দিতাও অসম্ভব খিটখিটে হয়ে যেতে থাকে। বিয়ের আগে যে নন্দিতাকে চিনত সুজয়, এ যেন মোটেই সে নয়। মাকে হারিয়ে, নন্দিতাকে হারিয়ে বড়ো অসহায় লাগতে থাকে তার। আজকাল যেন সমস্ত আত্মবিশ্বাস থুইয়ে বসেছে সুজয়। মনে হয়, যে পুরুষমানুষ নিজের ঘরটুকুই ম্যানেজ করতে পারে না, তার চেয়ে অপদার্থ কেউই নয়। সুমনা এবং নন্দিতার মুখে দিনরাত শুনে-শুনে সত্যিই নিজেকে একটা অকর্মণ্য গবেট মনে হতে থাকে তার। ধিক্কার দিয়ে বার-বার বলে সে— আমার দ্বারা কিছু হবে না।

—এই, কী বিড়বিড় করছ, নিজের মনে? ঝকমকে হাসি নিয়ে রীতাদি এসে দাঁড়াল সামনে। —'আজকাল সবসময় দেখি মুখ অন্ধকার। লানচেও একা-একা বসে খাও। কী হয়েছে বলো তো তোমার?

আঃ। কতদিন কেউ জানতে চায় নি তার ভিতরের টাইফুনটার খবর। কতকাল আগে মা শেষবার বলেছিলেন,— সুজয়, কী হয়েছে রে? তোর মুখটা অমন শুকনো কেন, বাবা?

রীতাদি এবার পাশে বসে পড়ে। সস্নেহে বলে,

—কী দেখছ হাঁ করে? কিছু একটা হয়েছে তোমার। বলে ফেলো না আমায়। মন হালকা হবে।

সুজয় তো হালকা হবার জন্য আকুল। নইলে এ পাহাড়প্রমাণ বোঝার চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে সে।

ইদানীং অফিস ছুটির পর সোজা বাড়ি যাচ্ছিল না সুজয়। খানিকটা সময় লেকের হাওয়ায় ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করত ভিতরের আগ্নেয়গিরিটাকে। আজও এসে বসল, তবে একা নয়, সঙ্গে রীতাদি। মেয়েরা ভাবে পুরুষমানুষ আশ্রয়দাতা; কিন্তু পুরুষ-মানুষও কারুর কাঁধে মাথা রাখতে চায়। আজ রীতাদিকে বড়ো দরকার সুজয়ের।

৪

সুজয়ের থেকে বছর পাঁচেকের বড়ো কলীগ রীতা সেনের শরীরে যৌবনের অভাব নেই, আবার মনটাও দিব্যি সমঝদার। কথা বলতে-বলতে মনে হয় রীতাদির মধ্যে পুরনো সুমনা আর অবিবাহিতা নন্দিতা হাতধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে যেন। সুজয়ের সব সমস্যা পরম আগ্রহের সাথে শোনে

রীতা, ধৈর্যের সঙ্গে সমাধান আলোচনা করে, সহানুভূতির সঙ্গে সান্ত্বনা দেয়। ধীরে-ধীরে রীতা সেনকে কেন্দ্র করে সুজয় আবার তার মৃত জীবনকে চাষ করতে থাকে।

ক্রমেই বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেতে থাকে সুজয়ের। নন্দিতা বেসুরো বেহালার মতো ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে বলে,—আর বাড়ি আসা কেন? যেখানে ছিলে বাকি রাত সেখানে কাটালেই পারতে।

– বাড়ি ফিরে করবটাই বা কী? ঘরে ঢুকলেই তো শুনতে হবে আমার মা তোমার প্রতি কী-কী অত্যাচার করেছেন, এখানে তোমার নরকযন্ত্রণা…'

— আমি কি মিথ্যে বলি?

ব্যাস, শুরু হয়ে যায় দৈনন্দিন কথাকাটাকাটি এবং অবশেষে কান্নাকাটি। তারপর খেতে বসলে শুরু হয় মায়ের কোটা। সুমনা কিংবা নন্দিতা কোনো-দিন চেয়ে দেখে না সুজয়ের মন ঠিক আছে কিনা। যে যার নিজের কোটা পুরিয়ে নিতে তৎপর। এই আত্মকেন্দ্রিক সুমনা আর নন্দিতার সাথে কিভাবে পরিচয় করতে হবে, কিছুতেই বুঝে উঠতে না পেরে সুজয় কেবলই আঁকড়ে ধরতে চায় রীতাকে।

সব সন্ধ্যায় রীতা সেনকে চাই-ই সুজয়ের। ক্রমে সিনেমা-থিয়েটারের সঙ্গিনীও রীতা।

—'আচ্ছা এত বয়েস অবধি তুমি বিয়ে করনি কেন রীতাদি?'

—তোমার জন্য। আমি বিয়ে করে চলে গেলে আজ তোমাকে কে বাঁচাত? হেসে বলে রীতা।

এত ছোটো শহরে গার্ল ফ্রেনড নিয়ে বেশি মাখামাখি করলে দুর্নামের কালি মুখে মাখতেই হয়। সুজয়ের নামেও কাদা লাগাতে দেরি হল না। এইবার সুজয়ের গৃহ সত্যিই শত্রু-গৃহ। সেখানে সুজয়ের পক্ষে বাস যথার্থ অসম্ভব। যে দুই নারীর মধ্যে কখনও কথার মিল দেখে নি সুজয়, তারা দুজনেই এখন গলা মিলিয়ে তাকে বলে 'চরিত্রহীন'। এবং রীতাদি সম্পর্কে যা বলে তা উল্লেখ না করাই ভালো।

রীতার উপরেও নানা চাপ আত্মীয়-পরিজনের তরফ থেকে। কিন্তু কোনো মূল্যেই রীতা আর সুজয় পরস্পরকে ছাড়তে নারাজ। সুজয় ভাবে তার তিরিশ বছরের পুরানো বাড়িটা যখন বন্যার জলে হারিয়ে গিয়েছিল, তখন রীতা সেনই তাকে দাঁড়াবার জমি দিয়েছে। রীতাকে ছেড়ে আবার কি বেনো জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে নাকি সুজয়? অসম্ভব। কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের জোর ছাড়া কতকালই বা এভাবে রীতাকে টিকিয়ে রাখা যাবে? এ নিয়ে দুশ্চিন্তার ঘুণপোকা কেবলই কাটতে থাকে স্বস্তির দরজা জানলা। কিন্তু রীতাদি বড়ো আশ্চর্য মেয়ে। এত বড়ো সমস্যার কথাতেও তার মুখে সমাধানের স্মিত হাসি।

—তুমি দেখি এখনও সেই মান্ধাতার আমলে আছ, সুজয়। সাত পাকের চেন ছাড়া অন্য কিছুর জোর আছে বলে বিশ্বাসই করতে পার না। এই চেনের জোর যে কত সে তোমার নন্দিতাকে দিয়েই দেখতে পাচ্ছ। বন্ধুত্বের জোরটা অনেক বড়ো জোর —এই আমার বিশ্বাস।

কী সুন্দর আধুনিক মানসিকতা রীতাদির, কেমন স্বচ্ছ উদার চিন্তা। স্বার্থপরের মতো খালি বিয়ে-বিয়ে করে না। সুজয়ের সুখের জন্য সে কত-খানি ছাড়তে রাজি। মুগ্ধ হয়ে যায় সুজয়।

কিন্তু শুধুমাত্র বন্ধুত্বের জোরে সমাজের বিরুদ্ধ শক্তিকে উপেক্ষা করা বড়ো সহজ নয়। ক্রমেই তা টের পেতে লাগল রীতা আর সুজয়। অবশেষে সামাজিক ঝড়ে রীতা সেনের মতো সবলারও পা টলমল। সুজয় খুবই দিশেহারা বোধ করতে থাকে। কী যে উপায় করবে কিছুতে বুঝতে পারে না। তবে কি রীতাকে ছাড়তে হবে?

—আমরা এবার কী করব, রীতাদি? অবশেষে একদিন প্রশ্ন করে বসল সুজয়। কিন্তু সেদিন রীতা হেসে অভয়দাত্রীর গলায় বলল,—তোমাকে কিছু করতে হবে না। চারিদিকের অবস্থা দেখে আমি

কিছুদিন ধরেই ট্রান্সফারের চেষ্টা করছি কলকাতায়। তুমি কি ভাবছ চুপচাপ বসে আছি? কালও তো এ ব্যাপারে দেখা করলুম বড়ো সাহেবের সাথে। মনে হয় মাস কয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে ম্যানেজ।

—সে কী, ট্রান্সফার? তোমাকে ছাড়া আমি···

সুজয় আর্তনাদ করে ওঠে।

—আমিই কি তোমায় ছাড়তে পারব, সুজয়? ছাড়াছাড়ি নয়, আরো কাছে পাওয়া। কলকাতা এখন থেকে কতটুকুই বা দূর বলো। প্রত্যেক উইক এনডে লোকাল ধরে তুমি চলে আসবে আমার একান্ত ফ্ল্যাটে। দেড়টা দিন একেবারে দুজনার। কলকাতা বড়ো শহর, এখানকার মতো কেউ মাথা ঘামাবে না বন্ধ দরজার ভিতরকার কাহিনী নিয়ে। সোমবার যে যার অফিসে। রোজ লানচ টাইমে চিঠি লিখব দুজনে দুজনকে আর শনি-রবির অপেক্ষায় অস্থির হব কেবলই। বলো তো সুজয়, এখানকার চেয়ে সেটা আরো বেশি রসদ যোগাবে কিনা?

—ওঃ! রীতাদি, গ্র্যানড। কবে বদলি হবে, রীতাদি। আনন্দে উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে সুজয়।

—দেখি, মাস ছয়েক হয়তো লেগে যাবে।

—এত সহজে এত ভালো সমাধান, এ কেবল তুমিই পার রীতাদি, আর কেউই পারত না।

সমাধান কিন্তু রীতা সেনকে করতে হল না। বিধাতাপুরুষ অন্য পথে সমাধান লিখে রেখেছিলেন।

•

বদলির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে রীতা। হরদম দৌড়াচ্ছে কলকাতায়। সুবিধামতো একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করা তো সহজ নয় কলকাতা শহরে। সুজয়ও মাঝে-মাঝে ছোটাছুটি করে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে পড়ে। তবে উইক-এনডের চমৎকার স্বপ্নটাই বারে-বারে তাদের চাঙ্গা করে তুলে ঠেলে দেয় কলকাতার জনসমুদ্রে।

আজকাল সুজয়কে একেবারে কাছে পাবার একটা তীব্র বাসনা নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে নিজেই অবাক হয় রীতা। জীবনের মধ্যভাগ অবধি এ বাসনা কোথায় আত্মগোপন করেছিল বুঝতে পারে না। ছটা মাস কম সময় নয়। নিজের ভেতরে যেন অস্থির হয়ে পড়তে থাকে রীতা।

বাস্তবিক ছটা মাস তো কম সময় নয়। এর মধ্যে বোন-ক্যানসার ধরা পড়ে। মাত্র দুটো মাস সময় নিলেন সুমনা দেবী। এ সময় রীতাকে ভুলে দিন-রাত মায়ের সেবা করল সুজয়। ক্রিয়াকর্ম সারা হলে অবাক হয়ে সুজয় ভাবল, যে-রীতা সেনকে ছাড়া একটা দিন চলবে না ভাবত, তার অভাব তো টানা দুই মাসে বোধ করল না সে। মানুষের মন বড়ো আশ্চর্য জিনিস। সুমনার মৃত্যুর পর নন্দিতা হয়তো দাম্পত্য জীবনকে আবার সুন্দর করে গড়ার চেষ্টা করবে, এমন একটা অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষাও দেখা দিতে লাগল সুজয়ের মনে। কিন্তু এবার নন্দিতাও তাকে মুক্তি দিল। এমন চরিত্রহীন স্বামীর ঘর আর সে করবে না জানিয়ে চলে গেল বাপের বাড়ি। অতএব সুজয় একেবারে ঝাড়া-হাতপা, রীতার বদলি হবার আগেই।

বদলির দিন এগিয়ে এসেছে। রীতা খুবই ব্যস্ত। পরিকল্পনা আবার কিছু বদলাতে হয়েছে তাকে। একা মানুষের জন্য একঘরের ফ্ল্যাট নিয়েছিল সে। কিন্তু এখন তো পরিস্থিতি অন্যরকম। বারে-বারে বাড়ি-বদল সুবিধাজনক নয়। একেবারেই একটু বড়ো-সড়ো ফ্ল্যাট খুঁজে নিল। অতএব বিয়েটা অবশ্য এখুনি করবে না। সুজয়ের মনের উপর দিয়ে যা ঝড় গেল। সেটা একটু শান্ত হোক। তা ছাড়া সমাজও তো একেবারে ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না।

বদলির দিন পাকা হয়ে গেলে সুজয়কে খবরটা দিতে গেল রীতা। সুজয় মাসখানেক ছুটি নিয়ে বাড়িতেই বসে আছে। রীতাও এতই ব্যস্ত যে দেখা করতে যাবারও ফুরসুত পায় নি। টেলিফোনে যখনই

কথা হয়েছে, সুজয় বলেছে, একা-একা থাকতে বেশ লাগছে, রীতাদি।' 'বুঝেছি, তোমার মন ভালো নেই। আর কটা দিন সবুর করো। এখন একদম সময় পাচ্ছি না।'

আজ রীতার মন খুশিতে ভরপুর। আসন্ন গৃহ-স্থালির স্বপ্নে যে এত সুখ তা কে জানত। সুজয়কে যে এমন পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে তা তো স্বপ্নেও আশা করে নি রীতা। বিধাতাকে ধন্যবাদ জানায় সে বার-বার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্য। সুজয়ের কাছে এসে বলল, —'পরশু বদলি হচ্ছি, সুজয়। তুমি এবার একটু উঠেপড়ে লেগে যাও কলকাতায় বদলি নেবার জন্য। ওখানে বড়ো ফ্ল্যাট নিয়ে ফেলেছি। এখানকার পাট যত তাড়াতাড়ি পার চুকিয়ে ফেলো। আর যে কোনো বাধা নেই সেইটে জেনে যেন মনটা কিছুতেই আর সবুর করতে চাইছে না।'

সুজয় চুপ করে তাকিয়ে রইল রীতা সেনের দিকে। সংসার পাতার চিরন্তন মেয়েলি আকাঙ্ক্ষায় আজ কেমন হ্যাংলার মতো দেখাচ্ছে রীতাদিকে। এর সাথে কি আগে পরিচয় ছিল? মনে করতে পারল না সুজয়। মনে-মনে বলল, 'মেয়েরা বহুরূপী।'

রীতা চলে গেল কলকাতায়।

কলকাতা অফিসে জয়েন করে দেখল সে আসার আগেই সুজয়ের চিঠি এসে বসে আছে। 'সুজয়টা পাগল একেবারে', ভারি আত্মপ্রসাদের সঙ্গে স্বগতোক্তি করল রীতা সেন। বাড়িতে গিয়ে আরাম করে চিঠিটা পড়বে মনে করে রীতা অফিসে খামটা খুলল না, সযত্নে জমিয়ে রাখল। আজ প্রথম দিন অফিসে বিশেষ কাজকর্ম নেই। চিঠিটাকে ছুঁয়ে মৌতাত পোয়াতে-পোয়াতে দাম্পত্যের নানা দিবা-স্বপ্ন দেখতে লাগল সে।

সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটে ফিরে ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে খামের মুখে চোখ রেখে রীতা বলল, —'সুজয়, এই-বার এসো।' কই অনেক বড়ো তো নয়, ছোটো মাপেরই একটা চিঠি। রীতা একটু ক্ষুণ্ন হল। সুজয়টার সাহিত্যবোধ কম।

'রীতাদি, কতবার ভেবেছি তোমায় কোন্ সম্পর্কে বেঁধে রাখব? তুমি যে মাও নও, নন্দিতাও নও। কিন্তু আজ ভাবছি—ভাগ্যিস তুমি মা কিংবা নন্দিতা হও নি, তবে তো তোমার সাথেও দ্বিতীয় বার পরিচয়ের দায় থাকত। পরিচিত প্রিয়জনের সাথে নতুন করে পরিচয় করা যে কত কঠিন, তা তুমি জান না, কিন্তু আমি জেনে গেছি। আমাকে ক্ষমা করো। তোমাকে আবার নতুন করে চেনবার চেষ্টায় মরে যেতে আমি ভয় পাই।'

প্রসঙ্গ গণেশ পাইন

সমীর ঘোষ

শিল্পী গণেশ পাইনের জন্ম ১৯৩৭ সালে, কলকাতায়। ১৯৫৯ সালে সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শিল্পশিক্ষাপাঠক্রমে 'ললিতকলা' বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯৫৭ সাল থেকে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি প্রতিষ্ঠানের বাইরে বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছেন এবং অর্জন করে নিয়েছেন রসিকজনের স্বীকৃতি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিল্পপ্রদর্শনীতে তিনি স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরবেরও অধিকারী। দেশে বিদেশে রসিকজন তাঁর শিল্পকর্মসংগ্রহেও আন্তরিক উৎসাহী। প্রদর্শশালাতেও তাঁর কাজ বিশেষ মর্যাদায় ইতিমধ্যেই স্থান পেয়েছে।

'সমসাময়িক কাল নিয়ে বাস্তব নিয়ে, তোমার কোনো ভাবনা হয় না?'—একবার এক সাপ্তাহিকের পাতায় এভাবেই একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল শিল্পী গণেশ পাইনের উদ্দেশে। উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, এ অভিযোগ অনেকেই করেছেন। আমি চেষ্টাও করেছি রিয়লিটি ধরে কাজ করতে, কিন্তু পারি নি। এক মুচিকে একবার আঁকলাম, মুচি আর মুচি রইল না, হয়ে গেল দার্শনিক।'

অবনীন্দ্রনাথ একবার রেখা-রঙে-বিবাদ-বাঁধা এক বাদশার ছবিকে নাম বদলে 'আবু হোসেন' করে দেন এবং ভাবের সঙ্গে ছবিকে গেঁথে ছবির নিজস্ব ভাষার জগতে প্রবেশের সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করেন। বেসুরো ছবি নামের জোরেই পার। কিন্তু গণেশ পাইনের মুচির দার্শনিকে রূপান্তর কি তেমনি কোনো অনির্দেশে উত্তরণ! তা বোধহয় নয়; কারণ শিল্পী স্বভাববিনয়ে যে উক্তিই করুন, রসিকজন বেশ ভালোই জানেন যে, বাস্তবতার বোধে বিশেষত কৃৎকৌশলে তাঁর সামর্থ্য বা সক্ষমতা প্রশ্নাতীত। সুতরাং জীবিকার সূত্রে ব্যক্তির বাহ্যিক রূপান্বয়ে তিনি যতটা আগ্রহী, তার পাশাপাশি অন্তর্গত বোধ, ব্যক্তিমানসের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটানো এবং উপস্থিত বস্তুর নিজস্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিল্পীর নির্মাণদর্শনের মেলবন্ধনের চেষ্টায় গণেশ পাইন সমান সতর্ক। সচেতন প্রয়াসে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর নির্মাণপ্রতিমা। একটি অনাবশ্যক রেখা বা রঙের বিন্দুকেও তিনি পটে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচারকৌলীন্যে অর্থমূল্যের নিরিখে শিল্পী গণেশ পাইনকে রুপোলি পরদার নায়ক বানানোর চেষ্টা হলেও তাঁর খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠার প্রকৃত তাৎপর্য বা শিল্পী-সত্তার গুরুত্ব শব্দ দিয়ে ধরা সহজ নয়। বুদ্ধি আর আবেগের সুচিন্তিত এবং সংযমী ব্যবহারে একের পর এক চিত্র-সৃজনে গণেশ পাইন ইতিমধ্যেই বর্তমান ভারতীয় শিল্পধারায় স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত।

বর্তমান চিত্রবিষয়ক জিজ্ঞাসার উত্তর নিছক সাক্ষাৎকার নয়। বেশ কয়েক বছরের নিত্যনৈমিত্তিক দেখাশুনোর মধ্যে, বিভিন্ন বন্ধুর সঙ্গে বা কখনো নিভৃতে আড্ডার ছলে নানা জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার প্রয়াসেরই কিঞ্চিৎ চিহ্ন বলা পারে। শিল্পীর শিল্পভাবনার বাইরে ব্যক্তিক জীবনের কোনো ছবি এখানে নেই। কিংবা ছবির বিষয়েও অনেক জরুরি প্রসঙ্গই বাদ

শিল্পী গণেশ পাইনের খসড়া খাতা : অংশবিশেষ।

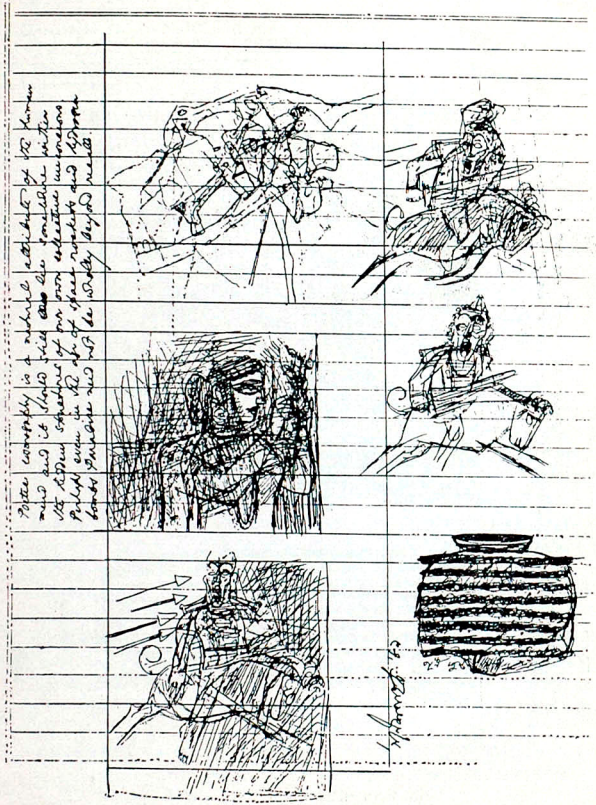

থেকে গেছে। তবু যে-কথা এখানে বলা হয়েছে, তার সবই সমসময়ের শিল্প-গঠন ও -সমস্যার ভাবনায় জড়িত। ব্যক্তিক এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ সার্বিক—এই দুই ধারার জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি লিখিত আকারেই জানিয়েছেন। অনেক প্রশ্নের উত্তরেই তিনি হয়তো তেমন বিস্তারিত ভাবনা প্রকাশ করেন নি। এটা এড়িয়ে যাওয়া নয়। কারণ অন্যত্র। বিশেষত দীর্ঘকালীন ছবির চর্চার পরিণতিতে এসে বর্তমান সময়ে অনর্গল শব্দব্যবহারে তাঁর একান্ত অনীহা। তা ছাড়া, প্রগল্‌ভ সিদ্ধান্ত টানায় তাঁর সংকোচকেও আমি এড়াতে পারি নি। সংগত জেনেই তাঁকে রেহাই দিতে চেয়েছি। যে সমস্যার সমাধান সহজে সম্ভব নয়, তাকে এককথায় সমর্থন বা বর্জন অনভিপ্রেত জেনেই হয়তো তিনি সংযত হয়েছেন। আর একথাও সত্য যে ছবির বিষয়ে শেষ কথা থাকে ছবিরই মধ্যে। শব্দ দিয়ে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা চলতে থাকলেও, ছবির বিকল্প শব্দ নয়, ছবিই। শিল্পী গণেশ পাইনের রঙরেখার সৃজনভাবনায়, নির্মাণে যে গুণ, তা তাঁর রচনাতেও বর্তমান। সামান্য প্রকাশেও উজ্জ্বল প্রকাশিত জিজ্ঞাসার উত্তরের মধ্যে দিয়ে উৎসাহী জন শিল্পের রসাস্বাদনে যদি আগ্রহী হন, সে উদ্দেশ্যেই এই আলোচনায় বিস্তার।

জিজ্ঞাসা : শিল্প-সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়

—ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মিশ্রণে ছবির আঙ্গিক নির্মাণের যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার তত্ত্বগত ভাবনা সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

গণেশ পাইন—ছবির আঙ্গিক যদি নতুন না হয় তবে তাকে আধুনিক বলে মেনে নেওয়া শক্ত। আভনবত্ব ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত—এহেন ধারণা আধুনিকের নয়। পটের হাতিয়ার তুলি রঙ কালি—এই নিয়েই তো ছবির আঙ্গিক, আর তার সনাতন পরম্পরা। কিন্তু নিয়ন আলোর টিউব নিয়ে আঁকা ছবি যখন আর্টগ্যালারিকে উচ্চকিত করে তখন সে ছবির আঙ্গিক আধুনিকতার দাবি করতেই পারে।

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা মিশিয়ে আঙ্গিক-নির্মাণ অনেকটা 'মধ্যপন্থাই শ্রেয়' গোছের বিবেচনা। 'আধুনিক' অবশ্যই ঐতিহ্যকে খারিজ করবেন অচলায়তন বলে। একই সঙ্গে ট্র্যাডিশনাল এবং মডার্ন হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

—পাশ্চাত্য শিল্পনির্মাণের ধারায় বেশ কিছু তত্ত্ব আন্দোলন ক্রমপর্যায়ে এসেছে। এর মধ্যে বর্তমান সময়েও কোন্‌টিকে দেশকালভেদে তাৎপর্যপূর্ণ বলে আপনার মনে হয়?

গণেশ পাইন—ফরাসি এবং জার্মান শিল্পের নব্য-ধারার কথা বলতে হয়। ইমপ্রেশনিজম-এর প্রতিষ্ঠা এবং তার পরবর্তী আন্দোলনগুলি নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এসব শিল্পতত্ত্বের সবকটিই যে সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা নয়। তার মধ্যে, আমার মনে হয় কিউবিজম, এক্সপ্রেশনিজম এবং সুররিয়ালিজম-এর তাৎপর্য সমধিক। হাল আমলের চিত্রকলায় ওই তিনটি মতাদর্শের স্থায়ী প্রভাব চোখে পড়ে। এর পরেও প্রতীচ্যে শিল্প আন্দোলন থেমে নেই, অপটিক আর্ট থেকে দ্য স্যারেটিভস পর্যন্ত নতুন-নতুন মতপথের মিছিল চলেছেই। আধুনিকতর এইসব তত্ত্বের স্থায়িত্ব নিয়ে এখনই কোনো ধারণা করা যাচ্ছে না।

—ছবির নির্মাণে আখ্যান বা কাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে আপনার ভাবনা। আখ্যানসমৃদ্ধ এবং আখ্যানমুক্ত ছবির পার্থক্যের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যসমূহ কী?

গণেশ পাইন—আখ্যানমুক্ত ছবি নিছক দৃশ্যগুণের দৌলতে সার্থক হতে পারে। আখ্যানযুক্ত ছবি মূলত অর্থসংকেতের কারণে আখ্যানের আশ্রয় নেয়, কিন্তু এ ধরনের ছবিতেও দৃশ্যগুণই বিবেচনার অপেক্ষা রাখে, আখ্যান নয়।

—ছবির পরিপূর্ণতা অর্থাৎ সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণাঙ্গ ছবির কোন্‌-কোন্‌ বিশেষ চরিত্রলক্ষণ থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে

মনে করেন ?

গণেশ পাইন—জাপানি শিল্পতত্ত্ব বলে, পূর্ণাঙ্গ ছবির প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সৌন্দর্যের সঞ্চার ঘটা চাই—তা সে ছবির বিষয় প্রণয় বা প্রলয় যাই হোক না কেন। যখন দেখি কোনো সিদ্ধ শিল্পীর রচনার কোনো সামান্য অংশকেও অবান্তর বলে বাদ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন কথাটাকে সমীহ করতেই হয়।

—নব্যভারতীয় শিল্পের উত্থানমুহূর্তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-বোধের (যা মূলত রীতিপদ্ধতিগত) যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, আজও তা সমানভাবেই ক্রিয়াশীল,—এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

গণেশ পাইন –ভারতীয় শিল্পে অভারতীয় প্রভাব কোনো নতুন ঘটনা নয়। আপনি যে দ্বন্দ্বের কথা বলছেন, তা আমাদের গোচরে ঘটেছে বলেই হয়তো সংঘাতের দিকটা বেশি করে চোখে পড়ে। আমার ধারণা, এদেশের শিল্প ভিন্‌দেশী শিল্পের সংস্পর্শে এসে, এমনকী সংঘাতের মধ্যে দিয়েও যে প্রক্রিয়ায় সমৃদ্ধ হয়েছে, আজকের দ্বন্দ্বও সেই প্রক্রিয়াতে সমাহারের ভূমিতে উত্তীর্ণ হবে। এ প্রসঙ্গে এমন কথাও মনে হয় যে প্রতীচ্য শিল্প বর্তমানে বহুলাংশে পুবদেশী শিল্পের কাছাকাছি, যেমন ছিল রেনেসাঁ-পূর্ব কালে। ফলে দ্বন্দ্বের তীব্রতা এমনিতেই অনেক কম।

—সমসময়ের অঙ্কিত কোন্ ছবি 'আধুনিক' কিংবা 'আধুনিক' নয়,—এই বোধ বা চরিত্রলক্ষণ কিভাবে নির্দিষ্ট হতে পারে ? এ বিষয়ে আপনার মত জানতে আগ্রহী।

গণেশ পাইন—আধুনিক এবং আধুনিক নয়—এমন দুটি ছবি চোখের সামনে রেখে আলোচনা করা যেতে পারত, কিন্তু এই মুহূর্তে তেমন সুযোগ নেই।

—একজন তরুণ কবির ভাবনা উদ্ধৃত করছি,—'কবিতা লিখতে দরকার হয় একটি নীরক্ত কলম, একটি নিষ্পলক কাগজ, আর একটি অলস ও ধূর্ত মস্তিষ্ক। কিন্তু ভরা কোটালে মাছ ধরতে যাচ্ছেন যে ধীবর, পর্বতশীর্ষে আরোহণ করেন যে প্রায়োন্মাদ অভিযাত্রী বা উনুনে ডাল সেদ্ধ করেন যে গৃহস্থ বধূ—তাঁদের কৃৎকৌশলে আছে কী অপরিসীম ধৈর্য আর শক্তি, কী তীব্র মেধা আর যুক্তি, কী অসামান্য যন্ত্র ও হাতিয়ার ; সেখানে বাতাসকে 'সবুজ' বা রাত্রিকে 'নীল' ভাববার মতো সামান্য খামখেয়ালিপনা দেখাতে গেলেই তুমুল সর্বনাশ ঘটে যাবে।'

এই ভাবনাকে ছবির নির্মাণে আপনি কিভাবে দেখতে চাইবেন ?

গণেশ পাইন—চিত্রকর কিংবা ভাস্কর কবির আক্রমণের লক্ষ্য নন—এটাই ভাগ্যের কথা। শ্রম কৃৎকৌশল ধৈর্য ব্যতিরেকে যে ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়া যায় না—কবি হয়তো তা জানেন।

শিল্পসম্পর্কিত ব্যক্তিক প্রসঙ্গ

—আপনার বর্তমান ছবির বিষয় আর নির্মাণ (সত্তর-আশির দশকের ছবিই মূলত) তার সঙ্গে পূর্ববর্তী ছবির (পঞ্চাশ-ষাট দশকের) ভাবনাচিন্তার নৈকট্য বা ব্যবধান, কোন্‌টি বেশি কাজ করেছে বলে মনে হয়।

গণেশ পাইন—ভাবনাচিন্তায় আমূল কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। মাধ্যম, আঙ্গিক ইত্যাদি নিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে ছবির গঠনে, উপস্থাপনার ভঙ্গিতে কিছু রদবদল হয়ে থাকবে। আসলে, শুরুর সময় থেকেই আমার ছবিতে এক-ধরনের অন্তরচারিতার ঝোঁক ছিল। সেটাই ক্রমে আহরিত, চর্চিত, অভিজ্ঞতার সুবাদে বিবর্তিত হয়েছে হয়তো।

—কারো কারো মতে একজন শিল্পী দীর্ঘ সময়ে নানা বিচিত্র গঠন ও অনুষঙ্গে চিত্ররচনা করলেও আসলে তিনি একটি চিত্রভাবনাকেই প্রকাশের চেষ্টায় উদ্‌গ্রীব থাকেন। এই ভাবনা বিষয়ে আপনার মত কী ?

গণেশ পাইন—এরকম ধারণা কেউ কেউ পোষণ করেন বটে একটি প্যাটার্নের ভেতরেই শিল্পী সম্ভবত তাঁর সমগ্র চিত্রদর্শন প্রতিফলিত করতে চান। জগৎ আর জীবন সম্পর্কিত তাঁর যা কিছু অভিজ্ঞতা তার সবটাই একটিমাত্র নক্‌শায় ন্যস্ত করতে ভালোবাসেন। ক্রমাগত নতুন-নতুন ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করার উত্তেজনা নয়, একটি ফর্মকেই পরিণতি দেওয়ায় তাঁর স্বস্তি থাকে।

—পাশ্চাত্যের শিল্পী পল ক্লী এবং স্বদেশের শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ—দুজনেই আপনার বিশেষ প্রিয়। এই দুই বিপরীত মেরুর ভাবনাকে কোন্ যুক্তিতে আপনি ছবির নির্মাণে ব্যবহার করেন ?

গণেশ পাইন—অবনীন্দ্রনাথ এবং পল ক্লী এক-যোগে আমাকে প্রভাবিত করেন নি। কেতাদুরস্ত শিল্পশিক্ষা শুরু করার আগেই আমার পরিচয় হয় অবনীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে। প্রভাব তখন থেকেই। তার বেশ কিছু কাল পরে আর্ট কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে যখন পথ খুঁজছি, তখন পল ক্লীর ছবি এবং ছবির বিষয়ে তাঁর আশ্চর্য সব ধ্যানধারণা আমার চোখ খুলে দেয়। অবনীন্দ্রনাথ এবং পল ক্লীর মধ্যে দেশকালের পার্থক্য ঢের, হয়তো সে কারণেই তাঁদেরকে বিপরীত মেরুর শিল্পী বলছেন। কিন্তু পল ক্লীর ছবি দেখে সেদিন আমার মনে হয়েছিল তিনি যতটা না প্রতীচ্যের শিল্পী, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাচ্যের।

—আপনার রেখাচিত্র এবং রঙের ছবি দুই-ই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত। অথচ আমার ব্যক্তিগত ধারণা বা বিশ্বাস যে আপনার বর্ণবহুল ছবিতেও রেখারই প্রাধান্য। এই দুই ভিন্ন আঙ্গিকের উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য এবং ছবিতে রেখা আর রঙের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কিছু বলুন।

গণেশ পাইন—রেখাচিত্রে লাইনের ভূমিকাই মুখ্য। বর্ণবহুল ছবিতে রেখার ব্যবহার কতটা থাকবে বা আদৌ থাকবে কিনা, সেটা শিল্পীই নির্ধারণ করবেন। পেনটিঙে রেখার ব্যবহার প্রকট হয় যখন ছবির জমি যে সমতল, দ্বিমাত্রিক এ সত্য মেনে নেওয়া হয়। অন্যথায় ছবির দ্বিমাত্রিকতা বোঝানো সম্ভব হয় না। স্পেসের অবতারণাও ওই সমতল ক্ষেত্রের অনুকূলে রাখতে হয় এবং পরিপ্রেক্ষিতবোধের চলিত নিয়ম সেখানে উহ্য থাকে। এটি সাধারণ সূত্র। স্পেস এবং শেপ রঙ দিয়ে গড়া হলেও আকারের গঠনবৈশিষ্ট্য বোঝাতে রেখা অনেকখানি সাহায্য করে।

—আপনার ছবির পটে রঙের বিন্যাস সাধারণভাবে সমতল নয়। প্রায়শই তা নানা স্তরবিন্যাসে যুক্ত। টানা রেখার পরিবর্তে ভাঙা রেখার আধিক্য। অথচ দ্বিমাত্রিক ভারতীয় ছবিতে অধিকাংশেই বোধহয় এই অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না। স্তরবিন্যাসের এবং রেখার বিশিষ্ট ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মতামত কী ?

গণেশ পাইন—স্টাইল জিনিসটা এমনই যে তার সপক্ষে শাস্ত্রসম্মত যুক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নিয়তি-কৃত নিয়মরহিত বলা যেতে পারে তাকে। অতএব আপনার এ প্রশ্নের উত্তর নীরবতা।

—আপনি যে ছবি আঁকেন, তার প্রায় অংশেই পুরাণ কিংবা অন্যান্য কথাকাহিনীর চিত্রকল্প প্রকাশমান। আখ্যানের উৎসনির্ণয়ে দর্শকের কৌতূহল থেকেই যায়। কিন্তু উৎসের রহস্য টানে চিত্রনির্মাণের অন্যান্য গুণ সম্পর্কে দর্শকের আগ্রহ কি এতে বাধা পায় না ?

গণেশ পাইন—ছবির দৃশ্যগুণই প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত। সে ছবি অবশ্যই মন্দ যার নির্মাণে কোনো মেধা নেই, সে ছবির চিত্রকল্পে যদি কাহিনীর ছায়া থাকে তাতে দর্শকের কিছু যায় আসে না। কাহিনীর উৎস নিয়ে আগ্রহ তখনই জাগতে পারে ছবি যখন তার নির্মাণসৌকর্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

—চূড়ান্ত সাদা আর চূড়ান্ত কালো—এই বৈপরীত্যের মধ্যে আপনার রঙের ছবি বা রেখাঙ্কন উভয় ক্ষেত্রেই মধ্যবর্তী বিভিন্ন পর্দার রঙের স্তর বা রেখার জটিল বুনোটে বিভিন্ন পর্দার স্তরভেদ তৈরি হয়। এই মধ্যবর্তী স্তরের প্রয়োজন কী কারণে আপনার ছবিতে প্রাধান্য পায় ?

গণেশ পাইন—সংগীতের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দুটি চরম স্বরের মধ্যে তানমীড়গমকের স্বর-পুঞ্জ নানা পরদায় বিন্যস্ত হয়, বিস্তৃত হয় সেতুর মতো ; উদ্দেশ্য—সুরের একটি অখণ্ড প্যাটার্ন গড়ে তোলা। সাদা আর কালোর মধ্যবর্তী নানা স্তরে বর্ণবিন্যাসের ব্যাপার অনেকটা এই ধরনেরই। কনট্রাস্ট-

এর ক্ষেত্রে আলো আর কালোর ব্যবধান বেশি, হারমনির ক্ষেত্রে কম।

—দীর্ঘ সময়ের ধারাবাহিক চিত্রচর্চা ও পরীক্ষানিরীক্ষার পর বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সাফল্য ও ব্যর্থতাকে আপনি কি-ভাবে দেখতে চান?

গণেশ পাইন—হিসেবনিকেশ করা হয় নি। কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার দায় ছিল না, তাই সে তত্ত্ব স্বীকৃতি পেল কি পেল না তা নিয়ে ভাবনাও নেই। পরীক্ষানিরীক্ষা যা করেছি তাকে নিতান্তই চর্চা ছাড়া আর কিছু বলা সংগত হবে না। কতকটা মনোমত ছবি যখন আঁকতে পেরেছি তখন সুখ পেয়েছি, মনশ্চক্ষে দেখা ছবি যখন শত চেষ্টায়ও এঁকে উঠতে পারি নি, তখন দুঃখ, তখন কষ্ট। ক্যানভাসে প্রাথমিক আস্তর চড়ানো থেকে শুরু করে তিলে-তিলে ছবি সারা পর্যন্ত আজও যা পাই তা নিজেকে ব্যয় করার, নিয়োজিত রাখার আনন্দ বই আর কিছু নয়।

আপনার চিত্রনির্মাণরীতির কোনো ধারা তৈরিতে আপনি কতটা উৎসাহী? এ ধরনের ঘরানা বা স্কুলিঙ গড়ে তোলা সম্পর্কে আপনার মত কী?

গণেশ পাইন—কোনো উৎসাহ নেই। ঘরানা বা স্কুলিঙ-এর অবকাশ আপাতত নেই। একালের শিল্পী স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করবেন—এটাই যুগধর্ম।

—আপনাদের অর্থাৎ পঞ্চাশ দশকের ছবির মূল চরিত্র-লক্ষণ কী, যা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রজন্মের ছবির বৈশিষ্ট্য থেকে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল?

গণেশ পাইন—পঞ্চাশের দশক আমাদের শিক্ষানবিশির কাল, অর্থাৎ ছাত্রাবস্থা। ষাটের দশকে শিল্পচর্চার শুরু, সে হিসেবে আমরা ষাট দশকের। পূর্ববর্তী প্রজন্মের ছবির বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা যে যেমন পারি উপাদান আহরণ করেছি যেমন, তেমনই আবার আপন-আপন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও আমাদের ছিল। আসলে পূর্ববর্তী প্রজন্মের মহিমা এবং কৌলীন্য থেকে অনেক দূরে ছিল আমাদের অবস্থান। ষাটের পরিবেশ তরুণ শিল্পীদের পক্ষে কিছুমাত্র অনুকূল ছিল না, সে সময়টা অস্থির, অগোছালো। অবনীন্দ্রপ্রবর্তিত রীতি তখন স্থবিরপ্রায় অথচ নন্দলাল বিনোদবিহারী রামকিংকর দেদীপ্যমান। ক্যালকাটা গ্রুপ নেই কিন্তু গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, হেমন্ত মিশ্র একক ভাবে প্রচণ্ড সক্রিয়। যামিনী রায়, অতুল বসু বিরাজ করছেন আপন গৌরবে। আর্ট কলেজে মডার্ন আর্ট পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত নয়, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা মনোনিবেশ করছেন নব্য ফরাসি রীতিতে, তাঁদের অবলম্বন সেজাঁ, ভ্যান গখ, গগ্যাঁ পিকাসোর প্রতিলিপি। শিক্ষা এবং প্রস্তুতি ছাড়াই নন-অবজেকটিভ আর্ট করা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। রাজনীতি এবং সমাজচেতনা শিল্পের আবশ্যিক মাত্রা—এই বিশ্বাস দানা বাঁধছে, শুদ্ধ শিল্প কঠিন সব প্রশ্নে যখন জর্জরিত, তখনই অতি-আধুনিক মার্কিন চিত্রভাস্কর্যের প্রদর্শনী এবং প্রচার প্রবল হয়ে উঠেছে। সেদিনের দর্শক নিতান্তই উদাসীন, শিল্পের কৃতী ছাত্ররা দিশা নেই দেখে ছবি আঁকার স্বপ্ন দেখতে চাইছেন না। এহেন দমবন্ধকর পরিবেশের মধ্যেই যেসব তরুণ ছবি আঁকার কাজে নিজেদের যুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন তাঁরা নিজেদের শিল্পসাধ জীইয়ে রাখার কারণে ছোটো-ছোটো দল গড়ে তুলতে লাগলেন। তত্ত্ব মাথায় রেখে দলগড়া নয়, যার যেমন অভিরুচি সেইমতো ছবির ভাব ভাষা মাধ্যম প্রকরণ নিয়ে খোলা মনে ধারা-বাহিকভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা। শ্রমশৃঙ্খলা ঐকান্তিকতার প্রসাদে এইসব শিল্পী ক্রমে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে থাকেন। সেদিন তাঁদের তরীতে কোনো কাণ্ডারী ছিলেন না, তাঁরা শুধু পাল তুলে দিয়েছিলেন খোলা হাওয়ার উদ্দেশে। উৎসাহই ছিল তাঁদের একমাত্র পুঁজি। এই উৎসাহই পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরাধিকার।

'সেক্যুলারিজম' এবং রাজনীতির 'ক্রিমিনালাইজেশান'-এর সমস্যা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কেবল বাংলাদেশেই নয়, উভয় বঙ্গের মননশীল বিদগ্ধ লেখকদের মধ্যে আহমদ শরীফ সাহেবের স্থান প্রথম সারিতে। নিছক প্রাঞ্জল ভাষা, স্খলিত রচনাশৈলী অথবা যুক্তিগ্রাহী উচ্চকোটির উপস্থাপনাই তাঁর বৈশিষ্ট্য আহমদ শরীফ সাহেবের রচনার ওইসব এবং প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকারের ওইজাতীয় আরও অনেক গুণাবলীর অতিরিক্ত সম্পদ হল তাঁর বক্তব্যের প্রসাদগুণ, যা একটি যুক্ত মনের উচ্চলোকবিহারী চিন্তন-মননের ছাঁতিতে সমুজ্জল। এজাতীয় চিন্তানায়কের তাবৎ বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকবর্গকে সর্বদা সহমত হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকার কথা নয়। কিন্তু তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত প্রতিটি চিন্তাভাবনার প্রতি যে-কোনো মননশীল পাঠককে সশ্রদ্ধ মনোনিবেশ করতেই হবে—এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই কারণে তাঁর এই সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সংকলনটি সাগ্রহে পাঠ করেছি এবং প্রারম্ভেই স্বীকার করি—পাঠ করে অত্যন্ত তৃপ্ত এবং উপকৃত হয়েছি।

সঙ্কলনটিতে তাঁর পনেরোটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সঙ্গত কারণেই "সেক্যুলারিজম" প্রবন্ধটির স্থান সর্বাগ্রে। শঙ্কটির বিজ্ঞান- ও ইতিহাস-অনুমোদিত ব্যাখ্যার সূত্র ধরে লেখক ঠিকই বলেছেন যে, ভারতের সেক্যুলারিজম 'হচ্ছে বাস্তবে সর্ব ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শিতা। রাষ্ট্রান্তর্গত যে কোনো ধর্মের ও ধর্মীয় চর্যার-চর্চার নিরাপত্তা দান।' অবশ্য তাঁর কাছে এর কারণ, এদেশের 'মধ্যযুগীয় বিশ্বাস-সংস্কারপুষ্ট' সংবিধানরচনাকারীদের জেনে-বুঝেই সেক্যুলারিজমের ব্যাখ্যায় গোঁজামিলের আশ্রয় 'নিয়ে' ছুকুল রক্ষার উদ্দেশ্য হলেও আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের ভারতীয় সংবিধানের জন্য কুণ্ঠিত হবার কারণ নেই।

তার গৌণ কারণ হল, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের (যার পরিণতি আমাদের সংবিধান) গান্ধী-ঐতিহ্য, যার অন্যতম উপাদান হল সর্বধর্মে সমভাব। আর এর মুখ্য কারণ হল ভারত-সহ বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের ধর্মে বিশ্বাস। শিশুকে স্নান করাবার পর ময়লা জলের সঙ্গে শিশুটিকেও ফেলে দেওয়া যেমন যুক্তিযুক্ত নয় (অথবা শরীফ সাহেবের মনোমত উদাহরণ দিতে হলে তাঁর শ্রেয় সমাজবাদের অনেকবিধ দোষত্রুটি ধরা পড়লেও তাকে সম্পূর্ণ বাতিল করা যেমন অসঙ্গত), তেমনি সময়ে-সময়ে মানুষের ঈশ্বরনিষ্ঠায় বিকৃতির নিদর্শন পাওয়া গেলেও অধিকাংশ মানুষের পক্ষে ঈশ্বর- এবং ধর্মনিষ্ঠা বর্জন করা না সম্ভব, না উচিত। 'ধর্মের তথা শাস্ত্রের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অস্বীকৃতিতেই সেক্যুলারিজম। সমাজ ও রাষ্ট্র ধর্ম সম্বন্ধে থাকবে সর্বপ্রকারে উদাসীন, শাস্ত্রাচার সম্বন্ধে সমাজ থাকবে নীরব-নিষ্ক্রিয়, রাষ্ট্র থাকবে অজ্ঞ উদাসীন'—শরীফ সাহেবের এই ভাষ্যে দ্বিবিধ দুর্বলতা আছে। প্রথমত ইউরোপে গির্জা আর রাষ্ট্রের যে দ্বন্দ্বের পরিণামে সেক্যুলারিজমের জন্ম, তাতে সমাজও ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন থাকবে—এমন দাবি বোধহয় ছিল না। দ্বিতীয়ত, তিনি যে শূন্যতার প্রচার করেছেন, তা কোনো যুগে কোনো দেশের জন-সাধারণের বৃহদংশের সমর্থন পায় নি এবং বোধহয় পাবেও না। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হল সত্তর

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র—আহমদ শরীফ। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। ষাট টাকা।

বৎসরের উপর জবরদস্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সোভিয়েত রাশিয়ায় আবার গির্জার ঘণ্টা বাজছে। বরং শরীফ সাহেব যা চান বহুলাংশে তার প্রাপ্তি সম্ভব সর্বধর্মসমভাবে। যে নামই দেওয়া হোক, এবং তার যে রূপই (এমনকী অরূপ হলেও ক্ষতি নেই) কল্পনা করা হোক, একটা পরম তত্ত্বকে মাপদণ্ড হিসাবে গ্রহণ না করলে অধিজনের পক্ষে সমীতিনিষ্ঠ থাকা সহজ নয়। শরীফ সাহেবের মতো নীতিপরায়ণ নিরীশ্বরবাদীরা সব যুগেই কোটিকে গুটিক, এবং সমাজের নিয়ম হিসাবে নয়, ব্যতিক্রম রূপেই তাঁরা সর্বকালে শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করে থাকবেন।

তবে সঙ্গে-সঙ্গে স্বীকার করা উচিত যে, ব্যক্তিগত স্তরে ঈশ্বরবিশ্বাস বা নিজ-নিজ বিশ্বাস আর রুচি অনুযায়ী ধর্মাচরণকে নিরুৎসাহিত না করেও শরীফ সাহেবের এই আদর্শ মেনে নিতে বাধা নেই যে 'ঈদগাহ কিংবা কুম্ভমেলার ঘাট সরকারি ব্যয়ে নির্মাণ করা যাবে না, যাবে না মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-মঠ মেরামত করা, ঈদের কিংবা বিজয়ার বাণীও দেওয়া যাবে না সরকার-প্রধানদের।' বরং বলা উচিত, ওই আদর্শ সেক্যুলার সরকার এবং তার নেতাদের আচরণীয় হওয়া অপরিহার্য। এই দিক থেকে বিচার করলে একথা না মেনে উপায় নেই যে, ধর্মকে রাজনীতির উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবার প্রয়াসে ইন্দিরা গান্ধী (সরকারি সফরকালে নানা বাবা-মায়ের পদপ্রান্তে আর মন্দির-মসজিদ-গুরুদ্বার ইত্যাদিতে ধরনা ইত্যাদি) থেকে আরম্ভ করে রাজীব (মুসলিম নারী রক্ষার আইন, দেউরিয়া বাবার আশীর্বাদ প্রার্থনা এবং অযোধ্যা থেকে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিগত নির্বাচন অভিযান শুরু করা ইত্যাদি), এবং এমনকী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং (জুম্মা মসজিদের সংস্কারে সরকারি অনুদান এবং পরিত্যক্ত আর পুরাতত্ত্ববিভাগের দ্বারা অধিগৃহীত দিল্লীর মসজিদগুলিতে বিগত রমজানের সময়ে নামাজ পড়ার অধিকার দান ইত্যাদি)—সবাই সেক্যুলারিজম-বিরোধী আচরণ করেছেন। আর ওইসব আচরণের সম্মিলিত ছুপরিণাম আজ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দাবানলে পরিণত হয়ে ভারতের অস্তিত্বকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে।

বাংলাদেশের সেকুলারিজমের ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে শরীফ সাহেব ভারতের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই দুর্বল অংশের প্রতি সঙ্গত কারণে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ, তাঁর মতে, ওদেশের এই লক্ষ্যাভিমুখী পদক্ষেপ বহুলাংশে ভারত দ্বারা প্রভাবিত। যাই হোক, ভারতের সেক্যুলারিজম সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের পূর্বোক্ত মতভেদের অংশটুকু বাদ দিলে বাদবাকি ওদেশের অগ্রণী বুদ্ধিজীবীর অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য হিসেবে উভয় বঙ্গের সবার মনোযোগের দাবি রাখে। এই কারণে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও তাঁর বক্তব্যের একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

'...একালে কেবল অধিজনের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির রক্ষণ-প্রচার ও প্রসার লক্ষ্যে রাষ্ট্রিক প্রয়াস মাত্রই অগণতান্ত্রিক, মৌল মানবিক অধিকার বিরুদ্ধ বলে অমানবিকও। রাষ্ট্রবাসী মাত্রের সমান নাগরিক অধিকার স্বীকৃত না হলেই কিছু মানুষ জিম্মি হয়ে যায়। জাত-ধর্ম-ভাষার কারণে উনজদের স্বদেশে-স্বস্থানে স্বঘরে স্বাধীনভাবে নিরাপদে স্বসম্পদে স্বপ্রতিষ্ঠ ভাবার পক্ষে যেকোন রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ব্যবহারিক বা মানসিক ভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন তারা স্বদেশে-স্বঘরেই নিজেদেরও নিজিত প্রবাসী ভেবে মানসিকভাবে হীনম্মন্যতায় ও জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার অনিশ্চয়তায় ভোগে, অধিগ্রস্ত হয়, দেশপ্রেমী হওয়ায় ও দেশসেবায় উৎসাহ হারায়।

'আমাদের দেশের এ মুহূর্তের সরকারি উচ্চারণে, কর্মে ও আচরণে মনে হয় এখানে কেবল মুসলিমরাই রয়েছে, অমুসলিমরা যেন আমাদের

চিন্তা-চেতনায়ও অনুপস্থিত। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রিক শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তার জন্যেই আমাদের সমাজতান্ত্রিক না হোক, সেক্যুলার হওয়া আবশ্যিক এবং নিতান্ত জরুরী।

'আমরা যদি পার্থিব ব্যাপারে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক আচারে-আচরণে শাসনে-প্রশাসনে নির্বিশেষে চিন্তা-চেতনার ও সমদৃষ্টির অনুশীলন করি—রাষ্ট্রবাসী মাত্রকেই সমান নাগরিক বলে মনে-মননে, কর্মে-আচরণে গ্রহণ করি, তাহলে উনজনেরা স্বদেশে স্বস্থানে স্বঘরে স্বাধীনভাবে নিরাপদে স্বসম্পদে স্বপ্রতিষ্ঠ বলে জানবে ও মানবে। দেশের মাটি ও মানুষ তারাও প্রিয়-প্রয়োজনীয় বলে অনুভব-উপলব্ধিগত হবে। যেহেতু সোয়া কোটি অমুসলমানের যাবার জায়গা পৃথিবীর কোথাও নেই, সেহেতু স্বদেশে হীনম্মন্যতারূপ আধির কারণ অপসৃত হলে, অধিজনের মতো জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সমদর্শিতা সুনিশ্চিত হলে ওরা প্রতিবেশী স্বধর্মীর প্রেরণায়-প্ররোচনায় কখনও আত্মদ্রোহী হয়ে আত্মহননের পন্থা অবলম্বন করবে না। স্বদেশের মাটিকে ও মানুষকেই আঁকড়ে থাকবে আপন ও আত্মীয় মেনে এবং নিজেদের স্বার্থেই তারা প্রাণের বিনিময়ে প্রতিরোধ করবে স্বধর্মী প্রতিবেশীর আক্রমণ। আমরা তিন দিকে ভারতপরিবেষ্টিত। এবং সেখানে 'কাফের রাজা বড়ই দুর্বার।' শ্রীলঙ্কায় যেমন, তেমনি স্বধর্মী-স্বগোত্র রক্ষার প্রয়োজনে ভারত বাঙলাদেশের উপর যে-কোন হুকুম-হুঙ্কার-হামলা চালাতে পারে। তা প্রতিরোধ করা ক্ষুদ্র দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সহজ হবে না।' (পৃ ১৪-১৫)।

লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অপর একটি নিদর্শন গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ "বিচ্ছিন্নতার ও সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব সম্বন্ধে বাঙলার ইতিহাসের কিছু তথ্যের সূত্রায়ণ।" বাঙলার মুসলমান সমাজের উদ্ভব ও বিবর্তন তিনি দেখেছেন এইভাবে :

'বাঙলার তথা ভারতের মুসলিমরা দুই শ্রেণীর —দেশজ ও বিদেশাগত। বিদেশাগতরা পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়া থেকে আগত—তারা শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্গত। দেশজ মুসলিমরা মুখ্যত অন্ত্যজশ্রেণীর —স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের, বর্গের ও বৃত্তির সাধারণভাবে প্রজন্মক্রমে দরিদ্র ও নিরক্ষর হিন্দু থেকে দীক্ষিত।

'উচ্চ বর্ণের ও বিত্তের লোক নৈতিক-সামাজিক ভাবে বিপন্ন না হলে কিংবা ইহজাগতিক ক্ষেত্রে আত্মোন্নয়নে প্রলুব্ধ না হলে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে উত্তর, দক্ষিণ বা পূর্ব ভারতে ইসলাম বরণ করে নি। কেননা তাদের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ ছিল এ যুগে কায়েমী স্বার্থবাজ সামন্ত-বুর্জোয়ার স্বেচ্ছায় কম্যুনিস্ট হওয়ার কিংবা শিল্পপতিদের শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার মতো আত্মহনন মাত্র' (পৃ ১৬)।

অতঃপর ওয়াহাবি আন্দোলন দমনকারী বড়লাট লর্ড মেয়োর আদেশে (সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে?) ১৮৭১ খ্রী. অধস্তন রাজপুরুষ হানটার-রচিত (কথিত আছে যে মাত্র তিন সপ্তাহে) *The Indian Musalmans : Are They Bound in Conscience to Rebel Against the Queen ?*-এর মাধ্যমে যে মিথ্যা ও অর্ধসত্যের প্রচার দ্বারা পরবর্তী কালে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে বিষিয়ে দিয়ে দেশবিভাজনের পথ প্রশস্ত করা হয়, তার অনেক বক্তব্য খণ্ডন করেছেন শরীফ সাহেব—যদিচ হানটারের নামোল্লেখ না করে। শরীফ সাহেবের বক্তব্যগুলি এই উপ-মহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রের কল্যাণকামীদেরই মনে গেঁথে রাখা প্রয়োজন :

'...স্বাধীনতা হারানোর ক্ষোভে-বেদনায় দিশেহারা দেশজ মুসলিমও ব্রিটিশবিদ্বেষবশেই যে ইংরাজি শিক্ষা বর্জন করেছিল বলে যে মিথ ঢালু

রয়েছে, তার মূলে কোন সত্য নেই। বরং মুর্শিদাবাদে যারা রাজ্য-রাজত্ব হারিয়েছিল, সে উর্দুওয়ালা শাসকগোষ্ঠী কোম্পানি সরকারের কাছে আবেদন করে কোলকাতার মাদ্রাসার মতোই মুর্শিদাবাদে ১৮২৪ সনেই (ইংরাজিকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা তখনো ওঠে নি) ইংরাজি স্কুল স্থাপন করিয়েছিল। প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠীর সমাজ ও শ্রেণীভুক্ত উর্দুভাষী রইসরা গোড়া থেকেই হিন্দুদের মতোই ইংরেজি শিখছিল' (পৃ ১৭)।

'.. ইংরেজ আমলে দেশজ মুসলিমরা (শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্থিক-সামাজিক কোনো সম্পর্ক ছিল না বলেই) অর্থ-বিত্ত-বিদ্যাক্ষেত্রে কিছুই হারায় নি আলাদাভাবে।···মোটামুটিভাবে ভাবে ১৮৫০ সন থেকে প্রশাসনের ভাষা রূপে ইংরেজি চালু হবার কাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ কাল অবধি ইংরেজি না-জানার দরুন দেশজ মুসলিমরা আয়-উন্নতির তথা অর্থোপার্জনের নতুন বিবর্তমান পন্থাগুলো—ওকালতি-চাকরি-ব্যবসা-বাণিজ্য-কারখানাদারি, ঠিকেদারি-আড়তদারি-দালালি-ঘুষ প্রভৃতি থেকে দূরে থাকায় দরিদ্র ও নিরক্ষর থেকে যায়। তারা যে কেবল ইংরেজি শেখে নি তা নয়, লেখাপড়ার ঐতিহ্য ছিল না বলে আরবি-বাঙলা-ফারসিও পড়ে নি। কাজেই আয়-উন্নতির তথা অর্থোপার্জনের উপায় ছিল না বলেই এসময়ে তাদের পরিবারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ভূসম্পত্তি কমেছে, ভূমিহীন হয়েছে অনেকে। ফলে তারা দরিদ্রতর হয়েছে ক্রমে। এ তাৎপর্যে তারা বিধর্মী শোষিত নয়, বিধর্মীরাও স্বেচ্ছায় সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিম শোষণে হয় নি আগ্রহী। এ হচ্ছে স্থানিক ও কালিক আর্থ-সামাজিক নীতি-নিয়মের ও রীতি-পদ্ধতির পারিবেশিক ও আবস্থানিক পরিণাম। সুতরাং হিন্দুরা শোষক এবং মুসলিমরা শোষিত বঞ্চিত—তত্ত্ব হিসেবে এ মানা যাবে না' (পৃ ১৮-১৯)।

'তুর্কী-মুঘল আমলে গাঁ-গঞ্জ প্রায় সর্বক্ষেত্রে হিন্দুর সামাজিক-আর্থিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণেই ছিল' (পৃ ১৯)।

'···মধ্যযুগে কোনো সময়েই কোনো দিক দিয়েই হিন্দুরা সচেতন ও সক্রিয়ভাবে দেশজ মুসলিমের আকস্মিক দারিদ্র্যের, দুর্ভাগ্যের ও দুর্ভোগের কারণ হয় নি।···মধ্যযুগে তুর্কী-মুঘল শাসনে গাঁয়ে বা শহরে হিন্দু-মুসলিমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে নি কখনো' (পৃ ২১)।

'কোম্পানি আমল থেকেই ভেদনীতি প্রয়োগে ব্রিটিশ শাসন পাকা-পোক্ত ও নিরাপদ-নিরুপদ্রব করার সুপরিকল্পিত লক্ষ্যে ভারতবাসীকে শাসক-প্রকাশক ইতিহাস-লেখকরা ধর্ম-বিশ্বাসভিত্তিক পরিচিতিতে বিভক্ত ও চিহ্নিত তথা অভিহিত করতে থাকে। এর আগে দৈশিক গৌত্রিক নামেই হত মানুষ চিহ্নিত ও পরিচিত: যেমন পার্শী, গ্রীক, শক, কুষাণ-হূন-তুর্কী-মুঘল-পর্তুগীজ···প্রভৃতি কিংবা উজবেক, বরবক, খালজি, তুঘলক, বলবন, লোদী, সৈয়দ প্রভৃতি গৌত্রিক নামে। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার লোকেরা ভারতবাসীকে চিহ্নিত করত হিন্দুইভী বা হিন্দুস্তানী নামে (মূলে সিন্ধু>হিন্দু>হিন্দ)।··· ইংরেজরাই সাম্রাজ্যিক স্বার্থে বিশেষ উদ্দেশ্যে তুর্কী-মুঘল শাসককে "মুসলিম" নামে অভিহিত করে'। (পৃ. ২০-২১)

'তাই উনিশ শতক থেকেই হিন্দু ইংরেজি-শিক্ষিত হয়েছে কেবলই হিন্দু, মুসলিম ও শিক্ষিত হয়ে হয়েছে দেশকালহীন মুসলিম—বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্বে ও ঐক্যে আস্থাবান। সবাই হল স্বধর্মীর স্বাজাত্যবোধে স্বচ্ছ। কেউ বাঙালি বা ভারতীয় থাকে নি, মুখে যা-ই বলুক অন্তরে বিশ্বাসে হয়েছিল হিন্দু কিংবা মুসলিম। কংগ্রেস ত্রিশ বছরের (১৯.৫-৪৬) আন্তরিক চেষ্টায়ও ধর্মমতনিরপেক্ষ দৈশিক জাতীয়তা লোকগ্রাহ্য জনস্বীকৃত করাতে

পারে নি। ব্রিটিশ ভারতের বিখণ্ডন তারই ফল। দুষ্টবুদ্ধি ব্রিটিশ ভেদনীতি সুফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছিল, যে বিষ নগরে-বন্দরে, স্কুলে-কলেজে সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছিল, তা আজও রয়েছে অবিলুপ্ত, বরং কখনও বদমতলবি রাজনীতিকরা তা সযত্নে সুতীক্ষ্ণ ও সুতীব্র করছে। বিচ্ছিন্নতার ব্যাপ্তি, সাম্প্রদায়িকতার প্রসার এবং দাঙ্গার (বাস্তবে হত্যার) অবিরলতা তাই সর্বত্র প্রকট।' (পৃ. ২২)

এমনি একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ "বাংলাদেশের চালচিত্র", যে নামে গ্রন্থটি পরিচিত। এদেশের সমাজব্যবস্থায় বর্তমানে যে প্রবল হতাশা এবং তজ্জনিত মৌলবাদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার নিদর্শন দেখা যাচ্ছে তার মূল আবিষ্কার প্রয়াসে শরীফ সাহেব দেখেছেন: 'আল্লাহনির্ভর, কোরআন-হাদিসের অনুগত আত্মপ্রত্যয়হীন এক শ্রেণীর শাস্ত্রবিদ ও ইংরেজি-শিক্ষিত মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে কোরআন হাদিস নির্দেশিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হলে একালেও মানুষের ব্যক্তিক, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের কোনো সঙ্কট সমস্যা থাকবে না। কেননা, কোরআন-হাদিস হচ্ছে একটা সর্বকালিক, সর্বস্থানিক, সর্বমানবিক জীবনব্যবস্থা। এরা মানব প্রকৃতি ও প্রগতি স্বীকার করে না, দেশ কাল মানুষের বিকাশ—বিবর্তনধারায়ও গুরুত্ব দেয় না, উপলব্ধি করে না, এ যন্ত্রযুগের ও যন্ত্রজগতের মানুষের আন্তর্জাতিক নির্ভরতা ও বৈশ্বিক জীবন। তারা সাড়ে তেরশ বছর আগেকার pastoral economy ব্যবস্থার জাকাত-ফিৎরাই আজো নিঃস্ব প্রতিবেশীর অনাহার প্রতিরোধে সমর্থ বলে মানে। ভাবে না যে কয়েক লক্ষ ধনীর দানে কোটি-কোটি লোকের সাংবাৎসরিক দারিদ্র্য, নিঃস্বতা কিংবা অনাহার ঘুচতে পারে না। অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, অবাস্তব বলেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিমুখ এ মত ও পথ আজকের রাষ্ট্রে ও সমাজে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে মানুষের চাহিদা মেটাতে কিংবা নানা সঙ্কট-সমস্যার সমাধান দিতে পারে না—পারবে না! তবু একদল আদর্শবান কোরআন-হাদিস মানা আল্লাহ-নির্ভর এবং মানবশক্তিতে আস্থাহীন মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে ও আদি ইসলামের রাষ্ট্রিক ও প্রশাসনিক রূপায়ণে বদ্ধপরিকর। জামায়াতে ইসলামী দল এদেরই।' (পৃ. ৩৩)

আবার নূতন যুগের দিশারি ছাত্র-যুবকদের কাছ থেকেও আশার আলো পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, '১৯৭২ সনের পর থেকে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই তাদের ছাত্রফ্রন্টে খুনে-দাঙ্গাবাজ সংগ্রহ করতে থাকে। তখন থেকেই অর্থের বিনিময়েই—রাজনীতিক কোন আদর্শবলে নয়, বিভিন্ন দললগ্ন ছাত্র ও যুবফ্রন্ট গঠিত হতে থাকে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।···জিয়াউর রহমান-এরশাদের আমলে ছাত্রদলগুলো দাঙ্গাপ্রিয় হত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে মাসল-ম্যান-মস্তান নেতৃত্বে এবং ভারতের যুবকংগ্রেসের অনুকরণে এখানেও মস্তান-পরিচালিত যুবদল গঠন করা হল, এরা কার্যত দল-অনুগত সেনাবাহিনী এবং ভাড়াটে গুণ্ডাদল। অদৃশ্য শক্তির প্রশ্রয় পেয়ে এবং আশ্রয়ে থেকে এরা এখন পাড়ার লোকের জান-মাল বিপন্ন এবং স্বস্তি-সুখ বিনষ্ট করছে। নানা অছিলায় চাঁদার নামে অর্থ আদায় করছে, তাছাড়াও কিশোরী তরুণীর ইজ্জতের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ার লোক এখন একাধারে ও যুগপৎ হুকুম-হুমকির ও অনুকম্পার পাত্র-পাত্রী। গোড়ায় সরকারই বিপুল অর্থের বিনিময়ে সরকার-সমর্থক ছাত্রদল গঠন করে মোনেম-জিয়া-এরশাদ আমলে। দলনেতারা সাদুচর সে অর্থ মদে-মেয়েমানুষে সিনেমায় রেঁস্তোরায় ব্যয় করে। রাজনীতিক আন্দোলন-উত্তেজনা-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ

না থাকলে বৃত্তি-ভাতা-ভাড়া কমে যায়। এখন নেশাসক্ত নেতা-মস্তানের সহচর অনুচর চেলারা রাস্তায় নামে রাহাজানি-হরণ-লুট-হাইজ্যাক-চাঁদা প্রভৃতি কাজে। সারা দেশে নৈরাজ্য ও ত্রাসের রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছে এইভাবেই (পৃ ৩৪-৪৫)।' পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র ভারতে রাজনীতির যে criminalisation বা অপরাধীকরণ হয়েছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থাটা তুলনা করা যেতে পারে।

এর উপর ভোগলিপ্সা ও ভোগবাদী সংস্কৃতি এমন প্রবল হয়েছে যে তার পরিণামে কেবল সব রকমের মাদকাসক্তিই বাড়ে নি অথবা 'সর্বত্র··· খুন-জখম-লুট এমনি পেশা ও নেশা'-ই হয়ে ওঠেনি, কিংবা 'শিক্ষিতরা নতুন রাষ্ট্রকে এ বিয়াল্লিশ বছর ধরে লুট করে ধানমণ্ডি-গুলশান-বনানী-বারিধারায় বাড়ি ভাড়ায় খাটিয়ে সন্তানদের বহু ব্যয়ে স্কুলে ও ঘরে পড়িয়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার রূপ অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনে সক্ষম "মানুষ" করে এখন বিদেশে পাঠাচ্ছে 'ডলার রোজগার' করতেই নয়, এমনকী 'শহরে ও পশ্চিম এশিয়ায়···চাকুরির নাম করে ক্রেতার, দালালের বা নারী পাচারকারীদের থেকে গোপনে টাকা নিয়ে তাদের হাতে সমর্পণ করে কোনো কন্যাকে।' ভোগবাদী মানসিকতার সর্বনাশা শিকার কেবল বাংলাদেশই নয়, আত্মাকে পয়সা-পরমেশ্বরের কাছে বিকিয়ে দেবার এই প্রক্রিয়া সক্রিয় প্রায় তাবৎ উন্নয়নকামী দেশে। শরীফ সাহেবের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এই মারাত্মক সমস্যার সমাধানের পথও উদ্ভাসিত হয়েছে। 'নিজেদের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন' হওয়া ও 'স্বনির্ভর' হওয়া, 'দেশহিতৈষী মানবসেবী সৎ মানুষ' এর আধার। কেবল দুঃখ, শরীফ সাহেব বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ ও কারণ আবিষ্কারে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিকে যতটা নিয়োগ করেছেন, ব্যাধির উপশমের পথ সম্বন্ধে যদি সেই তুলনায় আর-একটু বেশি নজর দিতেন!

মননশীল লেখক রবীন্দ্রনাথেরই মতো বিশ্বাস করেন যে 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ', তাই ভরসা রাখেন তাঁর স্বদেশের 'ভবিষ্যৎ অবশ্যই আছে, তা যত দূরেই থাক'। ভারতেও আমরা একই সমস্যায় ভুগছি। সুতরাং তার সমাধানে আমরা যারা তাঁরই পথের পথিক, তাই তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি 'মাভৈঃ'।

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেলেও শরীফ সাহেবের সাহিত্যকৃতির অপর এক উজ্জ্বল দিক—জীবনী-রচনার কথা—অন্তত সংক্ষেপে উল্লেখ না করলে সমালোচ্য গ্রন্থটির প্রতি সুবিচার করা হবে না। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটি এবং বঙ্কিম সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ তাঁর সারস্বত সাধনার এই ধারার নিদর্শন। বাঙলার নবযুগের এই দুই দিক্‌পালের কথা শরীফ সাহেব তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, অনবদ্য বিশ্লেষণী বিচার আর উচ্চাঙ্গের লিপিকুশলতার মাধ্যমে উপস্থাপিত করে এক শ্রেণীর লেখকের মেকি-আধুনিকতা-চালিত কুসংস্কার প্রচার-প্রয়াসকে খণ্ডন করার সঙ্গে-সঙ্গে এক অন্যতম জাতীয় ও সারস্বত কর্তব্য পালন করেছেন বলে তিনি উভয় বঙ্গের সুধী-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

প্রসার্যমাণ ঐতিহ্য-ভাবনা

বিজলি সরকার

দেশ-কালের সীমা ক্রমশই সঙ্কুচিত হচ্ছে। ফলে, বিভিন্ন দেশের সাহিত্যসংস্কৃতির পারস্পরিক যোগাযোগে এক অখণ্ড মানবসত্যকে খুঁজে পেতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। এই বিশ্বমানব অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমাদের বাঙালিদের পশ্চিমদেশান্তরের প্রতি আগ্রহ বেশি। অথচ জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বিষয়ে বিশেষ একটি ভৌগোলিক সীমার প্রকর্ষে আমরা মগ্ন থাকতে ভালোবাসি। ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের ব্যাপকতর পরিমণ্ডল কেবল বাঙলা সাহিত্য নিয়ে সমৃদ্ধ হয় নি, এতে সম্পৃক্ত হয়ে আছে অন্যপ্রদেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি। এবং সেখানে যে একটা সর্ব-ভারতীয় ভাবগত ঐক্যবোধ গড়ে ওঠা প্রয়োজন, তা আমরা ভেবে দেখি না। বাঙলা সাহিত্যের লেখকসমাজের একটা অস্থিমজ্জাগত উদাসীনতা রয়েছে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্য সম্পর্কে। শঙ্খ ঘোষের "ঐতিহ্যের বিস্তার" প্রবন্ধ-সংকলনটি বাঙালির এই অহমিকায় আঘাত করতে পারে। বিভিন্ন সময়ে লিখেছিলেন এমন বারোটি লেখা এখানে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে—"ঐতিহ্যের বিস্তার", "তিনচণ্ডালী", "কেন ইকবাল", "ইকবাল-প্রতিভার অপচয়?" ইত্যাদি প্রবন্ধগুলো বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে অন্যভাষার সাহিত্যের প্রতিতুলনীয় আলোচনা এবং এরই সঙ্গে দান্তে, কাফকা, পিকাসো, ওকাম্পো, এলিয়ট ও লুকাচ সম্পর্কে তাৎপর্যময় বিশ্লেষণ আমাদের ঐতিহ্যের গভীরতর স্তরের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে।

নিজের ভাষার বাইরে দেশেরই ভেতর অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যচর্চার ভিত্তিভূমি কী বা কেমন, তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির গুণগত মান এবং গোটা দেশের সংস্কৃতি এবং ভাবধারার সঙ্গে তা কতটা অন্তর্বিষয়ক—এটা আমরা ভেবে দেখি না। অন্য প্রদেশের কৃষ্টিকলা সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো উৎসাহ নেই বলেই হিন্দি সাহিত্যের একজন প্রধান শক্তিমান লেখক মুন্‌শি প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬), যিনি অবাস্তব জগৎ থেকে তুলে এনে হিন্দি কথাসাহিত্যকে বাস্তবতার জলমাটিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সাধারণ বাঙালি পাঠকেরা জানতে পারে অনেকই দেরিতে। শরৎচন্দ্রের মতো তিনিও সাধারণ মানুষকে তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছিলেন। যদিও মুন্‌শি প্রেমচন্দের গল্পে খেটে-খাওয়া কিষাণ-মজুর-চামারদের সমস্যা অনেক বেশি তাৎপর্য পেয়েছিল। অথচ প্রেমচন্দের গল্প প্রথম অনূদিত হয় সম্ভবত ১৯৪১-এ। (১৯৪১-এ "দেশ" পত্রিকায় সুবোধ ঘোষ "কফন" গল্পটি অনুবাদ করেন)।

রবীন্দ্রনাথের অমিত প্রতিভার প্রতাপে সে সময় দেশের অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি আলাদা করে নজর দেবার হয়তো অবকাশ ছিল না। কিন্তু তারপরেও পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। আজও আমরা জানি না রবীন্দ্রনাথের সময়েই কেরালায় কুমারন আসান, ভাল্লাথোল নারায়ণ মেনন এবং উল্লুর পরমেশ্বর আয়ার মালয়ালম কবিতায় আধুনিকতার পত্তন করেন। গভীর জীবনবাদী এই কবিদের কবিতা যথেষ্ট অনুবাদযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আজও এ ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা অটল। শঙ্খ ঘোষের এই লেখা থেকে আমরা সাধারণ পাঠকেরা জানতে পারি—রবীন্দ্রনাথের 'নলিনী' নামটি কুমারন আসানের জন্যই কেরালার জনজীবনে একটি প্রিয় নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কুমারন আসান রবীন্দ্রনাথে বিভোর থাকতেই পারেন, কিন্তু 'অসম্ভব নয় যে রবীন্দ্রনাথও কিছুটা উদ্‌বোধিত ছিলেন এই কবির সঙ্গে কথা বলে, দুজনের যখন দেখা হয়েছিল ত্রিবান্দ্রমে।' তখন কুমারন আসান বৌদ্ধ সূত্র থেকে আনন্দ আর চণ্ডালিকার কাহিনী নিয়ে লিখেছেন "চণ্ডালভিক্ষুকী"। এর দশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "চণ্ডালিকা" প্রভাবিত হবার বিষয়টি বিচার্য নয়, দেখবার বিষয় যেটা তা হল দুই প্রতিবেশী সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবেশকে মিলিয়ে নিতে পারলে আমাদের শিল্পবোধকে হয়তো আরো প্রসারিত করা যায় এবং তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মানসিকতায় নিজেদের আরো বিকশিত করা যায়। নিজেদের নিয়েই আত্মমগ্নতা আমাদের এত বেশি যে আমরা খবর রাখি না—ষাটের দশকে রাজনৈতিক অবক্ষয় এবং নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে বাঙলায় যেমন হাংরি জেনারেশনের কবিতার সূচনা হয়েছিল, হিন্দি ভাষায়ও অনুরূপ প্রতিবাদী কবিতা লেখা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল তেলুগু ভাষাতেও দিগম্বর গোষ্ঠীর কবিতা। এসব জানবার সুযোগ হলে নিজে-

ঐতিহ্যের বিস্তার—শঙ্খ ঘোষ। প্যাপিরাস, কলকাতা। তিরিশ টাকা।

দের সঙ্গে ভিন্ন প্রান্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঐক্য-ভূমিকে মেলানো যায়।

'সারে জাহাঁসে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' লিখেছেন ইকবাল—এই তথ্যটুকুই শুধু আমরা জানি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অমিয় চক্রবর্তী ইকবাল প্রসঙ্গে দু-একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কাছের প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতাজনিত অপ্রস্তুত দশার কথা ভেবে অমিয় চক্রবর্তী সে সময় আক্ষেপ করে-ছিলেন। এই অপ্রস্তুত দশা কিন্তু আমাদের আজও কাটে নি। এমনকী এর জন্য আমাদের দায়বোধও লুপ্ত। অন্যপ্রান্তদেশীয় কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে আগ্রহ থাকলে আমরা জানতে পারতাম যে ইকবাল কেবল পাকিস্তান-কল্পনার জনক ছিলেন না, ছিলেন না একান্ত কট্টর মৌলবাদী। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথাও ভেবেছেন। তাঁর "আস্রার এ খুদী"-তে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আত্মবিকাশের কথা বলেছেন। তাঁর প্রিয় গ্রন্থ ছিল উপনিষদ। অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর জীবনে ভগবদ্-গীতার প্রভাবের কথা। অথচ তিনি চিহ্নিত হয়েছেন অন্ধ ধর্মপ্রেমিকরূপে। স্বজাতীয়ের কাছ থেকে তিনি হিন্দুভক্ত বলে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই অনেক দুঃখ নিয়েই তিনি বলেছিলেন, 'গোঁড়া মুসলিম আমাকে কাফের বলে ভাবে আর কাফের ভাবে যে আমি নিছক মুসলমান।' তাঁর কবিতায় সূর্যকে দেবতা বলা হয়েছে, হিন্দু অবতার রামকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এর জন্য মুসলমান সমাজ তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে তার সামাজিক বা রাষ্ট্রিক চেতনাবিকাশের পটভূমিতে রেখে বিশ্লেষণ করলে আমাদের মনের সীমা সংকুচিত হবার অবকাশ পায় না। এবং এর জন্য দরকার অন্যকে জানবার ব্যাপারে সদাজাগ্রত কৌতূহল।

পশ্চিমী সাহিত্যশিল্পের প্রভাব বাঙলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজাগরণের সময় থেকেই চলে আসছে। প্রভাবিত হবার অনিবার্য উন্মাদনায় অনেক সময় তা বহিরঙ্গ রূপকর্মের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকে। বিষয়টির অন্তর্নিহিত বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে যায়। আলোচ্য বইটিতে "চণ্ডীদাস বা দান্তে" প্রবন্ধটিতে এই ব্যাপারটা বোঝা যায়। এই প্রবন্ধটি শঙ্খ ঘোষের তেইশ বছর আগের লেখা। এর বক্তব্য হল দান্তের "ডিভাইন কমেডি" র প্রজ্ঞা ও প্রেমের মিলিত রূপ মধুসূদনে বা উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায় না। "মেঘনাদবধ" কাব্যের দান্তে-প্রভাবিত নরকবর্ণনা শেষ পর্যন্ত 'সাংসারিক পীড়াজনিত অস্পষ্ট আক্ষেপের মতো শোনা যায়, ঊর্ধ্বতন কোনো আত্মিক মুক্তির সাধন-স্তর হিসেবে আসে না।' ব্যক্তি এবং বিশ্বকে একীভূত করে দেখবার দান্তের এই আধুনিক মানসিকতাকে যদি বর্তমান বাঙলা কবিতা গ্রহণ করে তবে আমরা দান্তের প্রজ্ঞা-প্রেমের আইডিয়াকে বুঝতে পারব।

লেখকের 'অন্তহীন সিঁড়ি: কাফকা' আলোচনাটিও কাফকার শিল্পচেতনার একটি নতুন দিক উন্মোচিত করে। অধিকাংশ সমালোচকের কাছে কাফকার শিল্প আশাহীন, আলোহীন এক আত্মবন্ধনের শিল্প। এড-মনড উইলসনের মতে কাফকা হলেন 'সংশয়ার্ত দলিত আত্মার অর্ধস্ফুটশ্বাস' মাত্র। কিন্তু কাফকা আসলে জানতে চান মানুষকে, মানুষের মৌলিক চাহিদাকে, সহজ সমাধানের পথে নয়, পরিপূর্ণ মানবাত্মাকে খুঁজতে চান জটিলতার মধ্যে। নির্যাতন আর সংশয়ের মধ্যে দিয়ে বরং মানবিকতা সংশোধিত হয়। ঘটে আত্মসম্পূর্ণতা।

তুলির মতো কলমেও পিকাসো উল্লেখযোগ্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। লিখেছেন কবিতা, নাটক। একজন শিল্পী কী করে সামগ্রিকতায় পৌঁছেছেন, শঙ্খ ঘোষের "পিকাসো : তুলি থেকে কলমে" প্রবন্ধটি পড়লে জানা যাবে। যদিও এটি তাঁর "কল্পনার হিস্টিরিয়া" বইয়ের অন্তর্গত, প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানেও লেখাটি স্থান পেয়েছে। কেননা, আমাদের শিল্প-ঐতিহ্যে অবনীন্দ্রনাথও ছবি-আঁকা থেকে পৌঁছেছিলেন

ছবি-লেখায়। এক ঐতিহ্যের সঙ্গে আরেক ঐতিহ্যকে মিলিয়ে দেখবার প্রাসঙ্গিকতায় আলোচ্য লেখাটিকে এখানে রাখা হয়েছে। এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে বিকশিত হবার সময়ে একজন শিল্পী কেমন করে দুটোর ভেতর ঐক্যময় সংযোগটি রক্ষা করেন, সেটি আমরা শঙ্খ ঘোষের এই আলোচনা থেকে বুঝে নিতে পারব।

রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" উপন্যাসটি বাঙলা সাহিত্যে বহুবিতর্কিত ও আলোচিত উপন্যাস। কিন্তু বিদেশেও উপন্যাসটিকে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়। বিখ্যাত মার্কসবাদী সমালোচক হাঙ্গেরীয় লুকাচ (Gyorgy Lukacs) কিভাবে "ঘরে বাইরে"কে বিচার করেছেন তারই আলোচনা "লুকাচ আর ঘরে বাইরে" প্রবন্ধটি। ১৯২২ সালে বার্লিন সাময়িকীতে "ঘরে বাইরে" সম্পর্কে লুকাচের কয়েকটি রিভিউর সাম্প্রতিক অনূদিত সংকলন নিয়েই শঙ্খ ঘোষের এই নিবন্ধটি।

লুকাচ মনে করেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই "ঘরে বাইরে" লিখেছেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মহান ত্যাগকে রবীন্দ্রনাথ ভ্রষ্টাচার মনে করেছেন। "ঘরে বাইরে"র সন্দীপ হল 'গান্ধীর এক শুক্কারজনক ক্যারিকেচার'। মার্কসবাদের অতি কৌকে লুকাচ এখানে কেন যে "ঘরে বাইরে"র সন্দীপের সঙ্গে গান্ধীকে জড়িয়ে ফেলেন! কেননা "ঘরে বাইরে"র জার্মান অনুবাদটি বেরিয়ে গেছে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের আগেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার লুকাচ দস্তয়েভস্কির প্রতিবিপ্লবী ভূমিকার সমালোচনা করেও মনে করেন যে, বিপ্লবের যে প্রয়োজন আছে তা নাকি দস্তয়েভস্কির লেখা থেকেই জানতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথকে বিচারের ক্ষেত্রে লুকাচ এত দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান, দস্তয়েভস্কির বেলায় সে বিচারপদ্ধতি পালটে যায়।

শঙ্খ ঘোষ এখানে "ঘরে বাইরে"র বিতর্ককে কোনো মীমাংসায় প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন নি। এখানে এই প্রসঙ্গটি এসেছে কেবল এইজন্যে যে যান্ত্রিক মার্কসীয় পন্থায় বিচারপদ্ধতি কেমন একপেশে হয়ে যায়।

"ঐতিহ্যের বিস্তার" গোটা বইটিতেই রয়েছে এমন অনেক তথ্য এবং সেই তথ্যবিশ্লেষণে রয়েছে লেখকের তীক্ষ্ণ বিচারশীল মানসিকতা। বিশেষ করে আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য-বিস্তারের পথটির প্রতি-বন্ধকতা কোথায় বা এই বাধা থেকে কী করেই বা উত্তীর্ণ হতে পারি, সে সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তা খুবই গুরুত্বময়। দেশের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সংস্কৃতির আদানপ্রদানের সম্পর্ক না থাকলে সেটা হবে আমাদের মানবিক ব্যর্থতা। আর এই ব্যর্থতার প্রতি উদাসীন থাকলে তা যে দেশের পক্ষে ভয়ংকর ক্ষতির ব্যাপার হয়, তা আজ দেশের পরিস্থিতির দিকে তাকালেই উপলব্ধি হবে। নিকটজনের প্রতি ঔদাসীন্য বা নিজের ঐতিহ্যের বাইরে অন্যের কাছে কিছু পাবার নেই—এটা ভেবে থাকলে তা হবে চূড়ান্ত বোকামি।

চারটি বাঙলা গদ্যগ্রন্থ

সুজিৎ ঘোষ

হোসনে আরা শাহেদের "গিন্নির ডায়েরি" বারোটি রচনার সংকলন। বিষয়নির্বাচনে লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি

গিন্নির ডায়েরী—হোসনে আরা শাহেদ। বইঘর, ঢাকা। ১৯৮৬। পঁচিশ টাকা।

টাকা দেবে গৌরী সেন—হোসনে আরা শাহেদ। মডার্ন লাইব্রেরী, ঢাকা। পঁচিশ টাকা।

যাত্রী—কাজী ফজলুর রহমান, মোর লাইব্রেরী। ঢাকা। ১৯৮৭। পঁচিশ টাকা।

দর্পণে প্রতিবিম্ব—কাজী ফজলুর রহমান। মোর লাইব্রেরী, ঢাকা। ১৯৮৭। পঁচিশ টাকা।

ও মনটি বুঝতে পারা যায়। প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে যে-সমস্ত উপাদান আমাদের চোখের সামনে ছড়ানো রয়েছে, তাই অবলম্বন করে লেখিকা গুরুতর ভাবনা-গুলিকে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু প্রকাশ করেছেন হালকা চালে, রম্য-রচনার রমণীয় রীতিতে। যেমন, "স্বর্গের টিকেট" নামে প্রথম রচনাটিতেই দেখি—লটারির টিকিট কাটার পরে ক্রেতার প্রত্যাশা। যে সমাজে টাকাই সুখ, স্বাস্থ্য, সামাজিক সম্মানের ছাড়পত্র, সেখানে ক্রেতা লটারির টিকিট কিনে স্বপ্ন দেখে, 'সব ব্যথা সব অভাব ভুলে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি, যদি পেয়ে যাই, যদি। তবু তো কিছুকাল স্বপ্ন দেখলাম। ছবি আঁকলাম আর বর্তমানের যাতনাকে ভুলে থাকলাম। আমার মতোন সাধারণ মানুষের জন্য, তুই-ই বল সখী, এও বা কম লাভ কি? —এই প্রশ্নাত্মক বাক্যের মধ্যে দিয়েই লেখিকার নিষেধ প্রকাশ পায় এবং মধ্যবিত্ত মানুষের যে দুর্বলতার রন্ধ্রপথে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত লটারিওয়ালা-দের মুনাফা বাড়তে থাকে, তা লেখিকা আমাদের জানিয়ে দেন। "দু ধ্য ব্যবসায়" রচনাটিতে আত্ম-কথন গদ্যরীতির সঙ্গে সংলাপের রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন লেখিকা। সূচনা: 'আমি আর তাকে নিয়ে পেরে উঠছি না। কর্তার কথা বলছি। লেখা-লেখির বাতিক আছে তাঁর।' এই সূত্র ধরে লেখার বা সাহিত্যর মূল্য ও বাজার-চলতি দরের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন, 'শুনেছি, সাহিত্যে নয়, বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বসতি।' বা, 'পাণ্ডুলিপি-হাতে তাকে দেখে আমার মনে হতো যেন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, বড় আদরের বড় যত্নের মেয়ে পাত্রস্থ করতে হবেই এবং সুপাত্রই তো চাই।' এবং শেষে, 'লেখার ব্যবসাটা জীবনবীমার মতোন। যদি নিষ্ঠা নিয়ে লেগে থাকা যায়, তবে মরণোত্তর লাভ কিছুটা হলেও হতে পারে।'

"রাশির ফের" রচনাটিতেও রাশিচক্র ও ভাগ্য নিয়ে মানুষের যে দুর্বলতা, যে দুর্বলতার মূলে থাকে সামাজিক অসহায়তা ও অনিশ্চয়তা, বিভিন্ন সংবাদ-মাধ্যম ও পত্রপত্রিকা কিভাবে সেই দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের বিক্রি বাড়তে সচেষ্ট, তা লেখিকা দেখিয়েছেন। 'এ অনেক সময় বাঁচিয়ে দেয় মানুষকে হতাশার বলিকাঠ থেকে। বিভ্রমসৃষ্টিকারী হলেও রাশিচক্রের জিৎ বুঝি এখানেই।...এর প্রতি আকর্ষণ মানবচরিত্রের সেই চিরন্তন সমৃদ্ধি-পিয়াসী সুখ-প্রত্যাশী স্বভাবটি থেকেই উৎসারিত।'

"মুকুরে মুখ" রচনায় সম্পর্কস্থাপনে বাঙালির বিশিষ্টতার দিকটি চিত্রিত করেছেন নানা উদাহরণে। বাঙালি একে অন্যকে দুঃখ ও সুখের অংশীদার করে অপার আনন্দ পেতে চায়। 'স্নেহ-প্রীতির নামে আছে বাড়তি দাবীর রীতি।' লেখিকার প্রশ্ন তাই, 'মনের ঐশ্বর্য খুইয়ে বাহ্যিক সম্পদে বাঙালি কতোটা লাভ-বান হবে।' "ব্যস্ততার ফাঁদে" নাগরিক জীবনের যে গতিবেগ আমাদের সুখ শান্তি স্বস্তি নষ্ট করছে এবং একই সঙ্গে এই গতি বেশবাস-সাজসজ্জায় পরিবর্তন আনছে, তারই ব্যস্ত ছবি ফুটিয়েছেন। "সুচতুর আমি"তে স্বার্থবোধকে সুকৌশলে লুকিয়ে আমরা ভালোমানুষ থাকতে চাই অন্যের চোখে—তা লেখিকা প্রকাশ করেছেন।

"এ কেমন খেলা" রচনাটির বিষয়বস্তু মানুষের পাশব প্রবৃত্তিকেই কিভাবে মানুষ খেলায় আর পয়সা উপার্জনের উপায়ে পরিণত করেছে, মুষ্টিযুদ্ধের খেলার খবর উপলক্ষে লেখিকা তা দেখাতে চেয়েছেন, 'চড় ঘুষি মেরেও এতো নাম? এরই জন্যে এতো প্রোগ্রাম, এতো উদ্যম? এরই জন্যে ক্ষেপা মানুষ তামাম দুনিয়ায়? ছেলে বুড়ো সব?' "যাঁরা এ্যাণ্টিকসও নন" রচনায় বস্তুর মূল্যের পাশাপাশি সমাজে মানুষের বার্ধক্যের অসহায়তাকে চিত্রিত করেছেন। "ফাল্গুনে গৃহিণী" রচনাটি পুরোটাই সংলাপ-রীতিতে লেখা: 'একে তো শ্রেষ্ঠ ঋতুর আগমন—তার ওপর আছে সংস্কৃতির জোয়ার।' কিন্তু 'দগ্ধীভূত' হতে হয়, তাই 'নন্দিত মাসটি' নিন্দিতও। "মুখর পুরুষে" পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর ওপর নানা বিধিনিষেধের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন লেখিকা: 'সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারী বহন করছে অন্তহীন অপবাদ। নিষিদ্ধ ফল খেয়েছেন আদম। অপরাধ ইভের। কেননা পরামর্শ নাকি তাঁর।' "কর্তার কথা"য় মূল আলোচ্য জীবন বড়ো, না বৃত্তি বড়ো। 'সারাটি জীবন অলীক আদর্শের জন্যে স্কুল টিচার হয়ে ক্ষয়রোগীর মতোন শুধুই নিঃশেষ হলেন যিনি, তাঁরই সন্তান যদি নির্বোধের মতোন ঐ একই সূত্র নিয়ে জীবনের জটিল অর্থ খুঁজতে প্রয়াসী হয়, তাকে নিবৃত্ত না করে উপায় কি—আপনারাই বলুন?' লেখিকার আক্ষেপভরা জিজ্ঞাসা।

"বাক্সবন্দী স্বপ্নে" প্রত্যাশা ও বাস্তবের বিরোধ দেখিয়েছেন। "প্রতিবিম্ব আমি" রচনায় দ্বিধাবিভক্ত সমাজে দারিদ্র্য ও বদান্যতার অসম অস্তিত্বে জীবনের ব্যর্থতাবোধ ও মানবিক মূল্যহীনতাকে দেখিয়েছেন।

"টাকা দেবে গৌরী সেন" বইটিতে মোট চোদ্দটি রচনা সংকলিত। প্রকৃত পক্ষে অন্য নামে ভিন্ন মলাটের মধ্যে আবদ্ধ হলেও এ-বইটি লেখিকার পূর্ববর্তী গ্রন্থ "গিন্নির ডায়েরি"র রচনাগুলির ক্রমানুসারী। রীতিতেও সেই রম্যরচনার রীতিই অনুসৃত, প্রবন্ধের গুরুভারকে সরসতায় মণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন লেখিকা। এ গ্রন্থে আছে,—পাবলিক নামের পার্টি, বিশেষণের ভুবন, রক্তের শত্রুতা, টাকা দেবে গৌরী সেন, হারু মিয়ার জয়, নিজগুণে সুখী হোন, সবাই মহাব্যস্ত, আমার প্রায়রিটি চাই, লাভবান হওয়ার লোভে, পরচর্চার স্বাদ, লটারিতে আত্মত্যাগ, কুকুর হইতে সাবধান, একদেহ দুই মন, টেলিফোনের ইডিয়ট। কোনো-কোনো রচনা পূর্ববর্তী গ্রন্থের রচিত বিষয়ের ভিন্ন ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি। ব্যঙ্গ এখানে কিছু বেশি।

"পাবলিক নামের পার্টি"-তে লেখিকা বলেন, 'কাজ হাসিলের জন্যে পাবলিক নামের কালেকটিভ নাউনটি বড় তোফা।' "বিশেষণের ভুবনে" মানুষের অতিরঞ্জনের স্বভাবটিকে লেখিকা দেখিয়েছেন। "রক্তের শত্রুতা" একটু স্বতন্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, আর এইচ ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা। "টাকা দেবে গৌরী সেনে" বরপণপ্রথার সমস্যা নিয়ে সরস আলোচনা করেছেন, বলেছেন, 'দেশের পাত্র-সম্পদকে দেশের মধ্যে ধরে রাখার জন্য, যৌতুকে সরকারি অনুদান বা মঞ্জুরি প্রদানের বিষয়টি কার্যকরভাবে পরিকল্পনায় আনার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের জান-মান দিয়ে লড়তে হবে।' "হারুমিয়ার জয়" বাইরে ভীতু অথচ স্ত্রীর ওপর তম্বি-করা স্বামীদের কথা। "নিজগুণে সুখী হোন"-এ লেখিকা বলেছেন, 'সুখ জিনিসটাকে নিজ-গুণে সৃষ্টি করতে হবে।' রাসেল তাঁর "কঙকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেসে"ও ওই একই বক্তব্য বলেছেন। "সবাই মহাব্যস্ত" রচনাটি পূর্ববর্তী গ্রন্থের "ব্যস্ততার ফাঁদ" রচনাটির সঙ্গে বিষয়গতভাবে একই। "আমার প্রায়রিটি চাই"-এ লেখিকার বক্তব্য: 'আমরা প্রাধান্য পাওয়াটাই খাতির বলে মনে করি।' "লাভবান হওয়ার লোভে"-তে লেখিকা দেখেছেন—লাভের লোভ এক ছোঁয়াচে নেশা। "পরচর্চার স্বাদ" রচনার নামেই বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "লটারিতে আত্মত্যাগ" পূর্ববর্তী গ্রন্থের "স্বর্গের টিকেট" রচনার সঙ্গে বিষয়গত সাদৃশ্য সত্ত্বেও বক্তব্যপ্রকাশে ভিন্ন। লেখিকা এখানে অবশ্য একই বক্তব্য রেখেছেন, 'নিরন্তর এক প্রলোভনই আদম সন্তানদের বাঁচিয়ে রেখেছে।' "কুকুর হইতে সাবধানে" দুই শ্রেণীর মানুষের বৈরী সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। "একদেহে দুই মন"-এ আমাদের ঔচিত্য-বোধ ও কার্যের মধ্যে বিরোধ প্রকাশিত। "টেলি-ফোনের ইডিয়টে" লেখিকা বলেছেন, 'এর মাধ্যমে বিশ্বরূপ প্রতিফলিত হয়। পরশুরামের "বিচিন্তা" থেকে সৈয়দ মুজতবা আলী পর্যন্ত বাঙালা রম্যরচনার যে ধারা, শ্রীমতী শাহেদের রচনা সে ঐতিহ্যকে অতিক্রম না করলেও তাঁর রচনার প্রসাদগুণ রয়েছে। যে যুগে সবাই মহাব্যস্ত হয়ে ব্যস্ততার ফাঁদে পা

দিয়েছেন, তাঁদের ব্যস্ততার ফাঁক শ্রীমতী শাহেদের রচনা দিয়ে ভরাতে পারবেন।

কাজী ফজলুর রহমানের "যাত্রী" ও "দর্পণে প্রতিবিম্ব" নামক গল্পগ্রন্থ দুটি একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে এগারোটি করে মোট বাইশটি গল্পের সংকলন। লেখকপরিচয় জানতে পারি—কাজী সাহেব যৌবনে লেখালিখি করতেন, কিন্তু সরকারি চাকরির দায়িত্বে সাহিত্য থেকে দীর্ঘদিন প্রবাসের পরে আবার সাহিত্য-অঙ্গনে ফিরে এসেছেন। কাজী ফজলুর রহমানের গল্পগুলি পড়তে ভালো লাগে, এক বৈঠকেই পুরো বইটা পড়ে শেষ করা যায়। অথচ গল্পের আঙ্গিক বা টেকনিক নিয়ে তিনি আধুনিকতম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি। নিরলংকৃত ভাষায় দেশপ্রেম, প্রেম, স্নেহ, মায়া-মমতা ইত্যাদি সনাতন অথচ সুস্থ মূল্যবোধগুলিকে গল্পের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। সে কারণে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। "যাত্রী" নামক প্রথম গল্পটিতে আমরা দেখি প্রেম ও সুখ চরিতার্থতা আর দেশের জন্যে আত্মোৎসর্গের মধ্যে গল্পের নায়ক দেশের জন্যে আত্মত্যাগকেই বরণ করেছে। এ গল্পে স্বাধীনতার যুদ্ধ বা বিপ্লব সম্পর্কিত যে তত্ত্বকথা নায়ক-নায়িকার সংলাপে এসেছে, তা গল্পের পটভূমি-পরিবেশগত পরিস্থিতিতে বেমানান হয় নি। কিন্তু রীতিটি খুবই সরলরৈখিক।

"নৈমিত্তিক" গল্পে এসেছে অর্থনৈতিক অসমবন্ধুত্বে তুলনামূলক ভালো অবস্থার 'বন্ধু'-টি কিভাবে অমানুষে পরিণত হয়, একদা প্রিয়তম বন্ধুকে ছলনা-বঞ্চনা করে। "আত্মহননের আগে" গল্পে একটি মেয়ে সৎভাবে বাঁচতে চেয়েও পুরুষশাসিত সমাজের অত্যাচারে আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। "মধ্যবিত্ত" ও "আকাশের সীমা" গল্পে মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত। ভালো লাগবে ডায়েরি-আঙ্গিকে লেখা "নামবিভ্রাট" গল্পটি। এ-রকমই নিটোল গল্প "দূরত্ব", "আগুন", "মরিয়ম কাঁদছে", "আত্মজ" গল্পগুলি। "জোয়ার" গল্পের ছেলে খিদে নিয়ে মায়ের কাছে খেতে চেয়েছে, কিন্তু খাদ্যের জন্য অপেক্ষমাণ ছেলেটির ঘরের অংশটা উন্মত্ত নদীর বন্যায় ভেঙে ছেলেটিকে নিশ্চেষে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এবং শোকস্তব্ধ মা-ও সেই মগ্নপ্রায় ঘরে স্থিরভাবে বসে থেকে বন্যার গ্রাসে ভেসে গেছে—বিষণ্ণতার মধ্যে মাতৃস্নেহের রূপটি অঙ্কিত হয়েছে। "প্রমোশান" গল্পে নিম্নবিত্ত আদালত কর্মচারী সৎ থাকতে গিয়ে দারিদ্র্যে ডুবেছে, মেয়ে তার বেতন বাকি পড়ায় স্কুলে প্রমোশন পেয়েও পরীক্ষার ফল হাতে পায় না, কন্যার লাঞ্ছনা অপমান ও স্ত্রীর গঞ্জনায় শেষে ঘুষ খেয়ে মেয়ের স্কুলের বাকি বেতন মেটায়, মেয়ের মুখে হাসি ফোটে রেজাল্ট পেয়ে, কিন্তু নিজের মানবিক অপমৃত্যুতে বাবার চোখে আসে জল।

"দর্পণে প্রতিবিম্ব" গল্প গ্রন্থটিতেও উল্লিখিত মূল্যবোধের পরিচয় মিলবে। "যেখানে হৃদয়" গল্পে বিদেশিনী নায়িকা সম্পত্তি নয়, হৃদয়ের সম্পর্ককেই বড়ো করে দেখেছে। নায়িকার প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার পরে দ্বিতীয় প্রেমের সূচনার আভাসেই আবার রোমান্টিক প্রেমের ওপর যবনিকা নেমে এসেছে। ভালো লাগবে কোথাও উন্মূল, যে যেখানে, ঠিকানা নামক গল্পগুলিও। "ওথেলো, ওথেলো" গল্পটিতে গল্পের মধ্যে আর-একটি গল্প বসানো হয়েছে এবং লেখকের মনন ও অধ্যয়নে নিষিক্ত হয়ে একটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। গল্পের সমাপ্তির চমকটিও চমৎকার। "শেকড়" গল্পে পূর্ব প্রেমিকার সঙ্গে প্রেম ব্যর্থ হলেও, কিছু অবশেষে থাকার হার্দ্য কাহিনী। "নিরাশ্রয় ভ্রূণ" গল্পে অত্যাচারী লম্পট ধনীর বিরুদ্ধে জয়নাবের অভিনব প্রতিবাদ চমক লাগায়। "মোহর" গল্পে মৃতা "নাদীর স্মৃতিচারণায় মানুষের" লোভ, প্রত্যাশা, হতাশা, স্নেহমমতা একাকার হয়ে মিশে গেছে, বিষয়গত ভাবে পরশুরামের "ধনুমামার হাসির" সঙ্গে মিল থাকলেও পরশুরামে গল্পের পরিণতি তীব্র ব্যঙ্গে, এখানে সমাপ্তি

কিন্তু স্নিগ্ধ কোমলতায়। "কোথাও আলোড়ন" গল্পটির রূপপরিণাম ভালো লাগে। "দর্পণে প্রতিবিম্ব" গল্পে প্রৌঢ় বিপত্নীকের দৌর্বল্যের সুযোগে লাস্যময়ী নারী রীতি-নিয়ম ভঙ্গ করে টেণ্ডার বাগিয়ে নেয় অথচ দেয় না কিছুই, ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে আসে নায়কের প্রৌঢ়ত্ব সম্পর্কে আত্মসচেতনতা। "দৃষ্টি পেরিয়ে গল্পে" জমির লোভে বাপ মেয়ের বিয়ে দেয় বয়সে অনেক বড়ো ও প্রথমা-পত্নী-থাকা মজিদের সঙ্গে। রাজিয়ার প্রেমিক তাকে নিয়ে বিয়ের আগেই পালাতে চেয়েছিল। রাজিয়া রাজি হয় নি, ভেবেছিল বুড়ো বর মরলে আবার ফিরে যাবে প্রেমিকের কাছে। বিবাহোত্তর পর্বে প্রেমিকের সঙ্গে গোপন প্রেম চলতে থাকে, স্টুডিওতে প্রেমিকের সঙ্গে গোপনে ছবি তোলে। মজিদের কর্মচারী জব্বরকে রাজিয়া গোপন আদান-প্রদানের দৌত্যে নিয়োজিত করে। জব্বর কোনো দিন লুকিয়ে দেখেছিল স্নানরতা রাজিয়াকে। জব্বর কিন্তু দৌত্যে অস্বীকৃতি জানালে, রাজিয়া মজিদকে সে-কথা জানিয়ে দেবে বলে ভয় দেখায়, রাজিয়ার নালিশে মজিদ জব্বরকে লাথি মেরে অজ্ঞান করে দেয়। তারপর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে অন্য স্নানকালে সেই জব্বর রাজিয়াকে রাজাকার ও পাকসেনার ভোগের কবল থেকে পালাতে সাহায্য করে ও নিজে রাজাকারদের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারায়।

কাজী ফজলুর রহমান যদি সরকারি উচ্চপদে সাফল্য কাম্য না মনে করে প্রবাহিত সময়ে সাহিত্য-কর্ম করতেন তা হল আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, আঙ্গিক-সচেতনতায় বাঙলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট গল্পকার হতে পারতেন। ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেই তো বাঙলা সাহিত্য, বলা চলে, সৃষ্টিলগ্ন থেকেই আন্তর্জাতিক মানের দাবিদার। অবশ্য আফশোসে কী লাভ। যা পাওয়া যাচ্ছে, তাও মন্দ না।

আকাশ ও নানা রঙের মেঘ

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণা বসুর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ "জল বাতাসে অন্ধকারে"। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিই পাঠককে মুগ্ধ, চমকিত করে। 'আমি চাঁদ বণিকের ডিঙা, / নদীর নির্জনে

জল বাতাসে অন্ধকারে—কৃষ্ণা বসু। প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭। আট টাকা।

নীল ক্ষুর চন্দ্রযান—জমিল সৈয়দ। অজ্ঞাতবাস, সি/২ আর. এইচ. ই., ৩০-ই রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৫৪। দশ টাকা।

আকাশ, আরো আকাশ—সুজিৎ সরকার। প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা। বারো টাকা।

অক্ষর পুরুষ—জয়ন্ত সেন। ব্যতিরেক, ফ্ল্যাট-জি/১, ব্লক-২১, গাঙ্গুলী বাগান, কলকাতা-৪৭। দশ টাকা।

অপারেশন থিয়েটার—নাসের হোসেন। কবিতা কথা, ১৫/২ সুরেশচন্দ্র পাল রোড, নৈহাটি, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ৭৪৩ ১৬৫। দশ টাকা।

জন্মভূমি একমাত্র জননী আমার—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈরবক, ১৬ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু, সর্বোচ্চ তল, পনেরো টাকা।

অবাধ্যের পুঁথি—ফল্গু বসু। অজ্ঞাতবাস, কলকাতা-৫৪। ছয় টাকা।

কবিতা কলকাতা—সম্পাদনা : অনিলকুমার দত্ত। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৫ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটর্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। কুড়ি টাকা।

পার করে—মীনাক্ষী ঘোষ। সাহিত্যদর্পণ প্রকাশন, ৩এ রজনী ভট্টাচার্য লেন, কলকাতা-২৬। আট টাকা।

রূপবতী একেলা—কিরণশঙ্কর মৈত্র। সাহিত্যদর্পণ প্রকাশন, কলকাতা-২৬। আট টাকা।

Now—Kiran Sankar Moitra. Writers Workshop Publication, 162/92 Lake Gardens, Calcutta-45, India. Rs. 50.

"I" is a Pronoun—Samarendra Sengupta. Papyrus, 2 Ganendra Mitra Lane, Cal : 700004. Rs. 30.

ডুবে আছি বহুদিন। / সারা গায়ে শ্যাওলা ধরেছে, / চুপ করে পড়ে থাকি ঠাণ্ডা কালো জলের গভীরে,…'। বস্তুত, কবিতাটি প্রতীকী। নিঃসঙ্গ ডিঙার এই না-ভাসতে-পারার যন্ত্রণা আসলে কবির নিজেরই পূর্ণতা-লাভের জন্যে বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস—এরকম মনে হতে পারে পাঠকের। কৃষ্ণার কবিতায় আরো কিছু বিশেষত্ব আছে। তাঁর কিছু কবিতায় খুব সূক্ষ্মভাবে গল্পের উপাদান মিশে থাকে। এবং এই গাল্পিক রূপরেখায় তিনি মূল্যহীন এবং অস্থির সমাজের বাস্তব ছবিটিকে আরো স্পষ্ট করে তোলেন। যেমন এই গ্রন্থের "তোমাদের শিশুকন্যা" কবিতাটি। এখানে কৃষ্ণা বিবাহবিচ্ছিন্ন, আধুনিক এক দম্পতির একমাত্র শিশু-কন্যার গোপন দুঃখের কথা আমাদের জানান। "বান্ধবী বিলাস", "উন্নতির সিঁড়ি", "রঙীন বান্ধব"—এইসব নিয়ে ব্যস্ত সেই দুজন আত্মকেন্দ্রিক নারী ও পুরুষ। ছোট্ট শিশুকন্যার কোনো খোঁজই তারা রাখে না। আর সেই দুঃখে একলা 'চিকন বালিকা' ছাত্রী-নিবাসের ঘরে বালিশে মুখ চেপে 'খুব রাতে একা একা কাঁদে'। এই ধরনের আরো একটি কবিতা "নিজের জন্যে বাঁচো"। এখানে কৃষ্ণা এক গৃহবধূর নিঃসঙ্গতার কথা বলেন—যার স্বামী অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। একদিকে স্বপ্নের নীল পৃথিবী এবং অন্যদিকে গতানুগতিক সংসারের আকর্ষণ—এ দুয়ের দোলাচলে কৃষ্ণাকে আলোড়িত হতে আমরা লক্ষ করি। যেন তিনি দণ্ডায়মান—'To the kindred points of heaven and home.' "স্বাস্থ্যল স্বপ্নে"র মধ্যে তিনি বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং নিজের সম্পর্কে বলেন: 'গূঢ় রোমান্টিক আমি আমূল নির্বোধ'। কিন্তু একইসঙ্গে আমরা বুঝতে পারি, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি, মধ্যবিত্ত বেঁচে-থাকার বিপন্নতাবোধ এসবের প্রতিও তিনি সমান মনোযোগী। এসবের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান 'সংসারের ছোট কিন্তু সুতীব্র মহিমা'। একবিংশ শতাব্দীর নারীকে কৃষ্ণা কল্পনা করেছেন স্বয়ম্বরা হিসেবে। এতদিন পুরুষই নির্বাচন করেছে নারীকে। কিন্তু আগামী শতাব্দীতে 'নারী চিনে নেবে তার রঙীন পুরুষ / বর্ণে কামে, তীব্রতায়, প্রতিযোগী রঙের বিন্যাসে!' ৫৪টি কবিতা আছে এই গ্রন্থে। প্রচ্ছদটি আরো আকর্ষণীয় হলে ভালো লাগত।

৫৭টি কবিতা নিয়ে জমিল সৈয়দের কাব্যগ্রন্থ: "নীল ক্ষুর চন্দ্রযান"। সত্তর দশকের প্রথম দিকে জমিল নিজেকে একজন শক্তিশালী কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহুদিন পর জমিলের এই গ্রন্থটি চোখে পড়ল। এই গ্রন্থে তিনি সম্পূর্ণ নতুন এবং নিজস্ব এক কাব্যভাষার প্রমাণ রেখেছেন যা নিরলস সাধনার ফসল, এবং যা একাধারে বিমূর্ত, অধিবাস্তব এবং সাঙ্কেতিক। তিনি এমন এক জগতের কল্পনা করেন যা সুদূর, অলীক ও অলৌকিক। তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতাও অবচেতনের গাঢ় অন্ধকার থেকে তুলে আনা। কবিতাগুলি পড়তে-পড়তে আমাদের যা প্রতিক্রিয়া হয় তা জমিলের নিজের ভাষাতেই বলা যায়: 'যেন পাললিক শিলা থেকে / আড়মোড়া দিয়ে জেগে ওঠে জীবাশ্মের দল, ঘুম থেকে উঠে / প্রশ্নের পর প্রশ্ন বিঁধিয়ে, শাণিত করতে চায় আমাদের বেঁচে-থাকা'। জমিলের কবিতা হল শব্দ দিয়ে শব্দের সচেতন নির্মাণ। তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে আছে এমন এক শিক্ষিত নিপুণতা যা পাঠককে সহজেই চমকিত ও প্রভাবিত করে। যেমন—'আচমকা অন্ধকার জ'মে গিয়ে পুলিশের ছদ্মবেশে / এগিয়ে আসছে মত্ত বাহুড়', কিংবা, 'সূচের ডগার উপর দাঁড়িয়ে থেকেছি আমি।' মাঝে-মাঝে জমিলের কবিতায় আমরা পাই সপ্রতিভ, শাণিত ব্যঙ্গের তীর। উদাহরণস্বরূপ: 'লোকালয় জনশূন্য হয়ে যাবে—এই ভয়ে / পুত্রকন্যায় ভরিয়ে দিচ্ছি পৃথিবী।' পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ এই গ্রন্থটির একটি বড়ো সম্পদ। মণীন্দ্র গুপ্তের বিমূর্ত প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা জমিলের কবিতার স্যুররিয়ল মেজাজের সঙ্গে খুবই মানানসই। প্রতিটি সৎ পাঠকের এই অভিনব গ্রন্থটি খুঁজে পড়া উচিত।

সুহিৎ সরকারের ৪৫টি কবিতার সঙ্কলন: "আকাশ, আরো আকাশ।" এটি তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। সুজিতও সত্তর দশকের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। তিনি বিশুদ্ধ কবিতার চর্চা করেন। কাকে বলা হবে বিশুদ্ধ কবিতা? আমাদের মতে তাই হবে বিশুদ্ধ কবিতা যা অপ্রয়োজনীয়-অলঙ্কারমুক্ত, নিরাভরণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত; এবং যে কবিতায় সত্য বলা ছাড়া কোনো কাজ নেই কবির। গ্রন্থের প্রথম কবিতাতে সুজিৎ আমাদের জানান: 'এখন আমার কণ্ঠস্বর / নগ্ন / এখন আমার উচ্চারণ / শুদ্ধ / এখন আমার কথা / মন্ত্র হয়ে যায়।' অনেক অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে, 'ছোট ছোট লোভ, সন্দেহ, ঘৃণা ও ভয়' পেছনে ফেলে রেখে সুজিত এখন বোধিবৃক্ষের উচ্চশিখরে আসীন। এখান থেকে তিনি মোহমুক্ত, নির্বিকার এবং নির্লিপ্ত এক দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকাতে পারেন। জীবনের যাবতীয় জটিলতা খুব সহজভাবে গ্রহণ করে তিনি নির্ভার বলতে পারেন: 'কী আমার সুখ, কী আমার দুঃখ, / বোঝাও যায় না আর—/ অনুভবে জাগে শুধু বিশ্ব, মহাবিশ্ব / শুধু আমি।' এই রক্তাক্ত, অশান্ত এবং অন্ধ সময়ে বাস করে প্রায় সকলেই যখন তাঁদের কবিতায় পতন, ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কথা শোনান, তখন সুজিৎ অপরিসীম আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাঁর কবিতায় সঞ্চারিত করেন এক শুভদর্শন, যা জীবনকে ভালোবাসার প্রেরণা জোগায়। দৈনন্দিন জীবনের বহু পরাজয় সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করতে শিখি: "সব 'না'-ই 'হ্যাঁ'-এর ভিতরে এসে সম্পূর্ণতা পায়।" সুজিতের কবিতায় 'আকাশ' শব্দটির এক বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য আছে। দু-রকম আকাশের কথা তিনি আমাদের বলেন। 'ছোট' আকাশ আর 'বড়ো' আকাশ। 'ছোট' আকাশ মানে সংসার,—যেখানে শুধুই বেঁচে থাকার গ্লানি, বিচ্ছেদ এবং অবিশ্বাস। পক্ষান্তরে 'বড়ো' আকাশ হল প্রকৃতির সান্নিধ্যে এক অনন্ত, মুক্ত জীবন যেখানে—'গভীর সবুজে নীলে ভরে আছে হৃদয়ের প্রান্তর আকাশ।' এবং যেখানে—'নাম নেই, অবয়ব নেই, সুন্দর ও অসুন্দরে ভেদ নেই'। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ সুজিতের কবিতার মতোই অনাড়ম্বর কিন্তু সুন্দর।

"অক্ষরপুরুষ" জয়ৎ সেনের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। বস্তুর দিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তাকাতে চান জয়ৎ। "অক্ষর পুরুষ" অর্থে পরমাত্মা ব্রহ্মাকেই উদ্দেশ করেন তিনি। তাঁর উচ্চারণ গাঢ় মন্ত্রের মতো গম্ভীর। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটির নাম—"অক্ষরপুরুষ"। তাঁর প্রতি জয়তের আবেদন—'উচ্চাসন থেকে নেমে প্রার্থনার মত / নতজানু হয়ে বলি—হেসে ওঠো অক্ষরপুরুষ'। তাঁর কবিতায় আমরা এক বলিষ্ঠ জীবনবোধের পরিচয় পাই। তিনি উপলব্ধি করেন—জীবনে পূর্ণতাপ্রাপ্তি সহজ নয়। বহু ব্যর্থতা আর পরাজয় অতিক্রম করে, নিজের ওপর আস্থা অবিচল রেখে সাধনায় একনিষ্ঠ থাকাই হল পূর্ণতালাভের উপায়। লিরিক্যাল মেজাজের এই কবির দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্নতায় ভুগলেও, একদিন শুভচেতনার ক্রমমুক্তি হবে। একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে 'একদিন সমবেত আমরা একই গান গাইবো / বাধাহীন মুক্তির প্রেম ও মানবিকতার / ঢলনামা সূর্যের যুৎকারে ধুয়ে যাবে / বন্যার তাণ্ডব, শোষণ ধর্ষণ বর্বরতা'। তবে জয়তের কবিতায় উপমা বা চিত্রকল্পের ব্যবহার কম। প্রায়ই তাঁর কবিতার বক্তব্য আমাদের কাছে ভারী আর গম্ভীর শোনায়। উদাহরণস্বরূপ: 'মানুষের মধ্যে আছে চিরন্তন সত্যের সাধনা / মানুষের মধ্যে প্রেম অনির্বাণ যুগ যুগ ধরে'। এই পুরোনো সত্যটি যদি তিনি চিত্রকল্পের মাধ্যমে বলতেন তাহলে বোধহয় তা আরো আধুনিক, আবেদনমুখর হয়ে উঠত। আশা করি, পরিণত বৈদগ্ধ্যের কবি জয়ৎ সেন এ ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবেন। স্বনামধন্য শিল্পী চারু খানের অপূর্ব প্রচ্ছদ ৩৮টি কবিতার এই গ্রন্থের মর্যাদা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করেছে।

নাসের হোসেনের কাব্যগ্রন্থ "অপারেশন থিয়েটার" দুটি পর্বে বিভক্ত। আঙ্গিক-সচেতন কবি নাসেরের কবিতায় বাচনভঙ্গির নতুনত্ব লক্ষ করি। নাসের আপাদমস্তক দুঃখবাদী। আধুনিক সময়ের গ্লানি, শূন্যতা এবং ধাতব যন্ত্রণা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন। যেন নরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত তিনি। তাঁর আর্তনাদ আমাদেরও আলোড়িত করে। জীবনের প্রতি কোনো মায়া বা টান-ভালোবাসা নেই নাসেরের। 'আমার বিধ্বস্ত যৌনবোধ, অধিকার, পা থেকে মাথা, রক্তমাংস, / আমার জীবন ছিটকে পড়ছে চিৎ হয়ে'। নাসের যেদিকে তাকান সেদিকেই দেখতে পান ধ্বংসের ছবি: 'কার্নিশে ঝুলে আছে শব, শুধু শব'। নাসেরের কবিতায় অভিনব চিত্রকল্প আর সপ্রতিভ বাচনরীতির সংমিশ্রণ। তাঁর কবিতা অ্যানটি-পোয়েট্রির খুব কাছাকাছি। মাঝে-মাঝেই পাঠকের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে চমক। যেমন—'কেঁপে উঠছে সময়, উড়ছে ব্যাণ্ডেজের ফিতে···' অথবা, 'বাদুড়ের মতো ডানা ঝাপটিয়ে সন্ধে নামে / নাকি হিটলার?' কিংবা: 'ছড়িয়ে রয়েছে লাশ / স্বতঃস্ফূর্ত অভিমান'। কিন্তু জীবনের অন্ধকার দিকের প্রতি নাসেরের আকর্ষণ একটু বেশি। অশুভ ব্যাপারগুলোই যেন শুধু তাঁর চোখে পড়ে। কিন্তু সুখ এবং দুঃখ, শুভ এবং অশুভ, যন্ত্রণা এবং আনন্দ—এসবের আলোছায়াময় তাঁতই হল জীবন। প্রকৃত কবি কিংবা শিল্পীর প্রবণতা হওয়া উচিত—এই দু-রঙা জীবনকেই বুঝতে চেষ্টা করা। কিন্তু নাসেরের কবিতা পড়লে মনে হয়—তিনি যেন দুঃখের উর্ননাভজালে আটকা পড়ে গেছেন। যেন তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন সমাজ থেকে, জীবনের মূল প্রবাহ থেকে। 'আমার সমস্ত শরীর নীল হয়ে গেছে, এই শরীরে আমি / মানুষকে ছোঁবো না···' বলিষ্ঠ কবি নাসেরের কাছে আমাদের প্রশ্ন: কেন এই বিচ্ছিন্নতাবোধ? জীবন কি শুধুই এক অপারেশন থিয়েটার? নাকি দুঃখবাদ নাসেরের প্রিয় বিলাস? গ্রন্থটি সুমুদ্রিত।

অনিলকুমার দত্ত-সম্পাদিত "কবিতা কলকাতা" এই মহানগরের ৩০০ বছরপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত। নিশীথরঞ্জন রায়ের ভূমিকাতে যদিও বলা আছে: 'কলকাতাকে কী চোখ আর মন নিয়ে তাঁরা দেখেছেন তার পরিচয় একশো কবির একশো কবিতার এই সঙ্কলনটিতে ফুটে উঠেছে,' কিন্তু গুনে দেখা গেল গ্রন্থে একশো কবি নেই, একশো কবিতাও নেই। কবি আর কবিতার সংখ্যা মোট ৮৭। তার মধ্যে বাঙালি কবির সংখ্যা ৭৯, এবং বাকি ৮জন হিন্দি-ভাষী কবি। "রূপা"-র মতো খ্যাতনামা প্রকাশনার কোনো গ্রন্থে এ ধরনের তথ্যগত ভুল থাকা ঠিক নয়। একেবারে ত্রিশের দশক থেকে বর্তমান সময়ের কবিদের ধরা আছে এই গ্রন্থে। কিছু কবিতা খুবই উচ্চমানের। যেমন—দিনেশ দাসের "কলকাতা", নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর "তোমাকে, কলকাতা", সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুপঠিত "আমি ও কলকাতা", যোগব্রত চক্রবর্তীর "কিশোরী কলকাতা", সুব্রত চক্রবর্তীর "বিবিজানের জানালা", সুব্রত সরকারের "কলকাতার পোকা"। এর সঙ্গে আছে—জীবনানন্দ দাশের "রাত্রি", সমর সেনের "সন্ধ্যা ও প্রভাত" এবং বুদ্ধদেব বসুর 'ইলিশ'। এই তিনটি কবিতাই পাঠকের পরিচিত। 'নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো'—জীবনানন্দের এই লাইনটি তো প্রবাদের মতো ব্যবহার হয়। এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাতেই কলকাতা শহরের ম্লান, হতশ্রী রূপের প্রকাশ। দুখিনী কলকাতার প্রতি দীপক রুদ্রের কবিতায় তীব্র শ্লেষ: 'তোর না তিলোত্তমা হবার কথা / তুই না ডানা মেলে উড়ে যাবি? /তোর আর মুখ দেখানোর মতো মুখ নেই রে। / কলকাতা, তুই থাক যেমন আছিস অন্ধকারে'। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কোনো-কোনো কবির চোখে ধরা পড়ে এই কলকাতার স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল বিভা। যেমন:

'রাত্রির নটায় কবে প্লেন থেকে তোমাকে দেখেছি / গ্রীক দেবী আর্টেমিস তুমি / কিংবা ভোরে কুয়াশার পাতলা আড়ালে জন্ম হচ্ছে ধীরে ভেনাসের।' (মঞ্জুষ দাশগুপ্ত)। কিংবা, 'সন্ধ্যা হলে বেজে ওঠে শাঁখ, / মানুষ অবাক হয়ে ছ্যাখে কী রূপসী কলকাতা। / মায়াবী শহর শুধু ভালোবাসতে জানে।' (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

৭৯ জন বাঙালি কবির সঙ্গে মাত্র ৮ জন হিন্দি কবিকে কী কারণে অন্তর্ভুক্ত করা হল, সেটা সম্পাদকের ভূমিকা থেকে স্পষ্ট নয়। গ্রন্থটির সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রশংসনীয়।

"জন্মভূমি একমাত্র জননী আমার" স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। সত্তর দশকের কবি স্বপন তাঁর পরিচিত জীবন নিয়ে কবিতা লেখেন। সে জীবন হল গ্রামবাঙলার শান্ত, সহজ, অনাড়ম্বর জীবন। বেশ সহজ এবং মৃদু ভঙ্গিতে কথা বলেন তিনি। নরম তাঁর অনুভব। অপরূপ তাঁর চিত্রকল্প। যেমন: 'বাতাসে টুপটাপ পাতা ঝরার মৃদু শব্দ পাই। / কুয়াশায় জড়ানো প্রান্তর, মোষের দুধের মতো / জ্যোৎস্না নেমেছে হাঁটু গেড়ে।' জীবনের জন্যে গাঢ় ভালোবাসা আছে স্বপনের। দারিদ্র্য, ব্যর্থতা কিংবা বেকারি—এসবের সামনে ভেঙে পড়েন না তিনি: 'অন্ধকারে হাঁটু গেড়ে বসতে শিখিনি কোনদিন / চিরকাল জয়ের উল্লাস নিয়ে জানাতে চেয়েছি— / সত্যের ভূমি ছুঁয়ে হাঁটো'। মানুষের জীবনে বিষাদ কেন আসে? এ প্রশ্নের উত্তর জানেন স্বপন: 'এটা চাই, ওটা চাই। / ফ্রিজ আছে, টিভি নাই···/ তখনই বিষাদ নেমে আসে।' গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পরিকল্পনাটি চমৎকার।

'শত জল ঝর্নার ধ্বনির' উদ্যোগে প্রকাশিত তরুণ কবি যন্ত্র বসুর কাব্যগ্রন্থ "অবাধ্যের পুঁথি"। 'আমি তো ছোটই / সবেমাত্র মাস দুই ভালোভাবে উড়তে শিখেছি'—এইরকম লাইনের মাধ্যমে যন্ত্র পাঠককে বোঝাতে পারেন যে, কবিতার আসরে তিনি নবাগত। এই গ্রন্থটি পড়ে আমাদের এরকম অনুমান হয় যে, তিনি স্বতন্ত্র এক কাব্যভাষার সন্ধানী। তার জন্যে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। একেবারে অন্যরকমভাবে, কিছুটা হয়তো বাঙলা কবিতার ধারাবাহিক ঐতিহ্যকে এড়িয়ে গিয়ে কবিতা লিখতে চাইছেন যন্ত্র। তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে পাঠক নতুনত্বের স্বাদ পেতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, 'চাঁদের মালিক এসে আমাদের পড়শীর উঠোনে / তিনঘণ্টা বসে ছিলো, অভিজ্ঞতা / পরীদের চেয়েও বেশী। নাকের দু'পাশে / বিন্দু বিন্দু চন্দনের ঘাম, চরিত্রে / কিছুটা আফিম, কিছুটা ঘুণের তাপ, আমি / লুঙ্গি পরা ছিল বলে কাছে গেলুম না। তবে 'ত্রেসিয়ারপরা ঘুমন্ত জোনাকি'—এটা কি যন্ত্রর হাস্যরসের প্রকাশ? এই গ্রন্থটি দুটি নির্দিষ্ট পর্বে বিভক্ত। দ্বিতীয় পর্বের ২২টি কবিতার বিষয় কীট, পতঙ্গ এবং নানা সরীসৃপ। যেমন "মাকড়সা", "চামচিকে", "ঔকুন", "গিরগিটি", "আরশোলা" ইত্যাদি। কবিতাগুলিতে বেশ অন্যরকম স্বাদ পাওয়া যায়। ৪৮টি কবিতার এই সাদামাটা গ্রন্থটিতে তরুণ এই কবির অহঙ্কার প্রোজ্জ্বল।

মীনাক্ষী ঘোষের "পার করে" কাব্যগ্রন্থে একজন নারীর প্রেমের জন্যে হৃদয়ের প্রচণ্ড দাহ অনুভূত হয়। মীনাক্ষী জীবনের সীমিত পরিসরে তৃপ্ত নন। তাঁর মধ্যে এক অস্থিরতা কাজ করে যা প্রকৃত শিল্পীর বা কবির। 'আমার সমস্ত সত্তায়, / বৃষ্টির মত, শিশিরের মত কিংবা / সুগন্ধি জোছনার মত যারা ঝরে, / কী নাম তাদের? / আশীর্বাদ? / ভালোবাসা? অথবা বিশ্বাস?' মীনাক্ষীর রোমানটিক মন স্বপ্ন দেখে। তাঁর সৌন্দর্যপ্রিয় চোখে প্রকৃতির বিভা মায়াবী আলোয় উদ্ভাসিত হয়। 'মাঝে মাঝে কোন এক আশ্চর্য রাত, / হঠাৎই খুলে দেয় বিশাল আঙিনা তার।' তবে মীনাক্ষীর কবিতায় শব্দব্যবহার নিয়ে

আমাদের কিছু বলার আছে। তাঁর একটি অতি-সংবেদনশীল মন আছে। কিন্তু ভালো কবিতা লেখার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট নয়। আধুনিক বা উত্তর-আধুনিক কবিতার ডিকশন তিনি এখনও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন নি। তাঁর ভাষাকে আরো সমসাময়িক, যথাযথ আর ইঙ্গিতময় হয়ে উঠতে হবে। আঙ্গিক এবং ভাবনা যখন একই বিন্দুতে মিলিত হয়, তখনই সফল কবিতা জন্ম নেয়। আশা করি, মীনাক্ষী এদিকে আরো মনোযোগ দেবেন। ২৯টি কবিতার এই গ্রন্থের প্রচ্ছদে রেখার ইঙ্গিতে সমুদ্রের সামনে এক নারীর ছবি উপন্যাসের প্রচ্ছদ হিসেবে মানানসই। কিন্তু কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ এরকম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

"রূপবতী একেলা" কিরণশঙ্কর মৈত্রর দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ। পরিচিত কবি ও লেখক কিরণশঙ্কর প্রকৃত-প্রস্তাবে সৌন্দর্যের পূজারী। তিনি একজন প্রেমিকও। তাঁর প্রেম মূলত দেহজ। নারীশরীরের কাব্যিক বর্ণনা কিরণশঙ্করের কবিতার অন্যতম আকর্ষণ: 'রূপবতী একেলা / অনন্ত প্রতীক্ষায় / অধরে অমৃত তার বাহুতে বিদ্যুৎ, / স্তনাগ্রচূড়ায় বিচ্ছুরিত অনন্ত বাসনা।' স্বপ্নবিলাসী কিরণশঙ্করের অপরূপ স্বীকারোক্তি: 'স্বপ্নের সবুজ আমার দু'চোখে / তাই কি শরীরে লালের গন্ধ?' শরীরে কামনার তীব্র বাসনা এবং চোখে রূপের মুগ্ধতা নিয়েও কিরণশঙ্কর মাঝে-মাঝে বিষণ্ণতায় ভোগেন। কারণ, বয়স বাড়লেও অসময়ে আসে প্রেমের হাতছানি। 'রক্ত উজান-রক্তক্ষরণ / কেন অসময়ে? / স্বপ্নের ডাকপিওন, সহসা কেন / অবেলায় নীল চিঠি বয়ে আনে?' কিরণশঙ্করের কবিতা পাঠকের পড়তে ভালো লাগবে। কারণ তাঁর ভাষা অতি মায়াময় এবং আগাগোড়া কাব্যরসে জারিত। চিত্রকল্পের ব্যবহারও অতি নিপুণ: 'জাদু-ঘরের বিচিত্র সম্ভারসহ / অন্ধকার বিশাল মহিষ।' বহু অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে, জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার উপভোগ করেও জীবনবিলাসী কিরণশঙ্করের অতৃপ্তি মেটে না। 'এ জীবন সে জীবন আরেক জীবন / সয় না ভাষার ভার / পরিপূর্ণতার রাজ্যে ছড়ায় / অপূর্ণতার হাহাকার।' বইটির প্রচ্ছদ বনলতা সেনের স্মৃতি বয়ে আনে।

রাইটার্স ওয়ার্কশপ থেকে প্রকাশিত কিরণশঙ্কর মৈত্রর আরো একটি কাব্যগ্রন্থ—*Now*। এটি ৪০টি ইংরেজি কবিতার সঙ্কলন। বাঙালি কবি কিরণশঙ্কর ইংরেজি ভাষাতেও বেশ দক্ষ। অনেক কবিতা পড়েই বোঝা গেল, তিনি তাঁর নিজেরই বাঙলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। যেমন: *To Live Through* (একটা কিছু), *That Life* (জন্মান্তর), *Time* (সময়), *Immersion* (এখন-ওতো আছি) ইত্যাদি। অনূদিত কবিতাগুলি কবির নিজেরই অনুবাদ বলে আড়ষ্টতা কম। মনে হয়, মৌলিক কবিতাই পড়ছি। *Lone Planet* কবিতায় অসাধারণ এক উপমা চোখে পড়ল: 'The nude women lie / like prostrated horses / drawn by an unskilled painter'। রাইটার্স ওয়ার্কশপ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত যে-কোনো গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থটিরও মুদ্রণের পরিচ্ছন্নতা আর প্রচ্ছদের আভিজাত্য পাঠকের এবং ক্রেতার নজর কাড়বে।

প্যাপিরাস থেকে প্রকাশিত কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের ১৫টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ: '*I' is a Pronoun*'। পঞ্চাশ দশকের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি সমরেন্দ্র। তাঁর একটি নিজস্ব, অননুকরণীয় কাব্যভাষা আছে। জীবনের দিকে তিনি তাকান সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। শব্দকে তিনি ব্যবহারের করেন অস্ত্রব্যবহারের মতো যত্নে আর সতর্কতায়। স্বাভাবিকভাবেই, সমরেন্দ্রর কবিতার যথাযথ অনুবাদ খুব সহজসাধ্য নয়। কিন্তু যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ইংরেজি ভাষায় বিশেষজ্ঞ। অনুবাদকেরা হলেন—অন্নদাশঙ্কর রায়ের পত্নী লীলা রায়, মণীশ নন্দী, কবি ও সম্পাদক প্রীতিশ নন্দী, ইংরেজি ভাষার অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা চক্রবর্তী এবং সমালোচক ও গল্পকার শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত। ১৫টি কবিতার মধ্যে ৮টির অনুবাদক লীলা রায়। তিনি এবং অন্যান্যরা যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন মূল কবিতার শব্দক্রম বজায় রাখতে। '*I' is a Proncun*-কবিতাটি উদ্ধৃত করা যাক: "I I I—I am the ULTIMATE / my voice cried? / Everybody around me eyed me, / Somebody thought / I am an expelled rebel? / A little girl divine/ comes close to my breath and / whis-pers Do you know / "I" is a pronoun?" প্রেমেন্দ্র মিত্রকে উৎসর্গীকৃত এই গ্রন্থটি বিদেশী পাঠকদের কাছে আধুনিক বাঙলা কবিতার একটি নিটোল ধারণা এনে দেবে। এজন্যে প্যাপিরাসকে আমাদের সাধুবাদ দেওয়া উচিত। পুর্নেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

কুতুবমিনার ও একটি শিশুর হাসি

[তামিল গল্প]

ইন্দিরা পার্থসারথি

অনুবাদ : সুব্রাহ্মনিয়ম কৃষ্ণমূর্তি

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই পরছিল ভাস্কর। তার পেছনে দরজার ওদিকে শাড়ির খশখশানি। বুঝল, অনুজা পেছন থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। খুব অস্বস্তি বোধ করল ভাস্কর।

সে আয়নার ভিতর দিয়ে দেখল। দুজনের দৃষ্টি আয়নার ওপারে পরস্পর ধাক্কা খেতে দুজনেই সঙ্গে-সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল। আত্মস্থ হবার চেষ্টায় ভাস্কর কানাড়া সুর ভাঁজতে লাগল।

অনুজা ঘরে ঢুকল। তার ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের আভাস। 'আজ কী ব্যাপার? বড্ড বেশি সাজগোজ হচ্ছে দেখছি!'

ভাস্কর উত্তর দিল না। দেওয়া দরকার মনে করল না। অনুজা হাসপাতালে দু বছর কাটিয়ে এসেছে। চিকিৎসার ফলে রোগ সেরেছে ঠিকই, কিন্তু রোগের সঙ্গে বুদ্ধিও উধাও হয়েছে। সন্দেহের ভূত পেয়ে বসেছে ওকে।

টাইয়ের গিঁট ঠিকমতো বাঁধতে পেরে ভাস্কর খুশি হল। গানে আরো মেতে উঠল সে।

'হুঁ, গাইতেও ইচ্ছে করে দেখছি। যৌবন ফিরেছে নাকি?'

রাগে ভাস্করের মুখটা রাঙা হয়ে গেল। অনুজার কথার পালটা জবাব দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিল।

অনুজা এভাবে কথা বলছে কেন? সে কি নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে? সে কি চায় যে তার নিজের দুর্বলতার সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য তার স্বামীও বুড়িয়ে যাক। না হলে সে নিজেকে বিপন্ন মনে করছে কেন?

'বাবা! বাবা!' বলে দৌড়ে এসে ভাস্করের পা-দুটো জড়িয়ে ধরল তার বাচ্চা মেয়ে রমা।

'এত দৌড়াদৌড়ি কিসের রে?' বাচ্চাকে ধমক দিল অনুজা।

'বাচ্চারা ছুটোছুটি করবেই। তাতে কী হয়েছে?'

'হ্যাঁ তুমিও একটি বাচ্চা। তুমিও ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটি করো না···।' অনুজা বিছানায় বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

ভাস্কর বুঝল, অনুজা বেশ উত্তেজিত হয়েছে।

'রমা, আমার শুটা আনো তো।'

রমা ছুটে গিয়ে শুটা বয়ে নিয়ে এল।

'আমি কোনো কাজ করতে বললে তুমি কর না, বাবা বললে কর। তুমিও গ্রাহ্য কর না আমাকে।' বিড়বিড় করল অনুজা।

তার শিরদাঁড়ায় কী একটা শক্ত রোগ হয়েছিল। দু বছর হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তাকে। অস্থি-চিকিৎসাবিশারদ ডক্টর শঙ্করনের অক্লান্ত চেষ্টায় চলাফেরা সম্ভব হয়েছিল তার পক্ষে।

আশ্চর্য, অনুজার শরীরে রোগের যে আঘাতটা লেগেছিল, তা তার মনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এখন সে মনে করে যেন সমস্ত দুনিয়া তাকে অবহেলা করছে।

কল্পনাশক্তির একান্ত অভাব অনুজার। সে নিজের শারীরিক ব্যথাটাই বোঝে, ভাস্করের মনের ব্যথাকে বুঝতে পারে না। যে ব্যথা কথা বা অশ্রুজলে ব্যক্ত হয় না, তার অস্তিত্বকেই মানতে রাজি নয় সে। কিন্তু ভাস্কর চাপা প্রকৃতির লোক। আবেগপ্রদর্শন তার ধাতে নেই। ফলে অনুজা মনে করে তার স্বামী তাকে উপেক্ষা করে, তার দুঃখ বোঝে না। এরকম এরকম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য এবং অসন্তোষ বাড়া স্বাভাবিক।

ভাস্কর কোট পরতে লাগল।

'ফিরতে দেরি হবে?' অনুজার জিজ্ঞাসা।

এখন ভাস্করের মনে পড়ল। আজ বিকেলে তার একটি ইংরাজি নাটক দেখতে যাওয়ার কথা। কথাটা অনুজাকে বলবার মতো অনুকূল পরিবেশ হয় নি বলে আগেই বলা হয় নি। এখন অনুজা জিজ্ঞাসা করায় বলতে হল, 'হ্যাঁ আইফক্স হলে একটি ইংরাজি নাটক দেখতে যাব।'

'ও! আর-একটি টিকিট কার জন্য, জানতে পারি?'

তা হলে তার কোটের পকেটে তল্লাশি করেছে অনুজা। নাটকের দুটো টিকিটই দেখেছে। এরকম রোজ তল্লাশি করে কেন? তার কি এত অবিশ্বাস তার স্বামীর উপর? টিকিট দেখে নিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করে কেন, ফিরতে দেরি হবে কিনা? ভাস্কর সত্যি বলে কি না পরীক্ষা করার জন্য? হয়তো ভাস্করের সত্যি কথা বলায় সে একটু নিরাশ হয়েছে। সেইজন্য সে এখন অন্যভাবে তার উপর আক্রমণ করছে।

'আর-একটি টিকিট কার জন্য?'

'রাজুও যেতে পারে···আচ্ছা, তুমি যাবে?'

'আমাকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য যদি তোমার থাকত আগেই আমাকে বলতে।'

'এ নাটকটা একটু সিরিয়াস ধরনের···তোমার ভালো লাগবে না বলেই···'

'তুমি যা বলতে চাও, খুলেই বলো না। আমি বেরসিক, আমি মূর্খ। আচ্ছা, রসজ্ঞানে যে তোমার সমকক্ষ, তাকেই নিয়ে যাও, সে রাজুই হোক, আর কেউই হোক।'

'আর কেউ মানে?' ভাস্কর চেঁচাল।

'তা আমি কী জানি।'

'তুমি কী ভাবছ, স্পষ্ট করে বলো না।'

'বললাম তো? আর কী বলব? নাটক দেখতে যাওয়ার কথাই আমাকে বল নি আগে। জিজ্ঞেস করলাম বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছ। প্রতিটি ব্যবহার তোমার এরকম। মনে দোষ থাকলে···'

'আমি কী দোষ করেছি তোমাকে বিয়ে করা ছাড়া?' ভাস্কর রাগের চোটে বলে ফেলল, কিন্তু পরমুহূর্তেই এই রূঢ়তার জন্য অনুতপ্ত হল। কথাটা অনুজাকে অব্যর্থভাবে আঘাত করল তার দুর্বলতম স্থানে। স্বামী-স্ত্রীর সামাজিক সম্পর্কের সীমা পেরিয়ে মানুষের আত্মরক্ষার আদিম প্রেরণা অনুজাকে অভিভূত করল।

তার কী কান্না, কী রাগ, কী অসহ্য প্রলাপ!

অনুজার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে তার স্বামীর শক্ত-সমর্থ শরীর তার নিজের নিরাপত্তার শত্রু।

তাকে বোঝানো যায় কী করে?

সত্যি, ভাস্করের পক্ষে ওরকম রূঢ় কথা বলাটা ঠিক হয় নি। কিন্তু এখন কী করা যায়? অনুজাকে শান্ত করা সহজ নয়। সুতরাং তার বিড়বিড়ানি থেকে পালিয়ে বাঁচল ভাস্কর।

ছেলেবেলা থেকেই অনুজা একরকম হীনম্মন্যতা পোষণ করে এসেছে। সে মানুষ হয়েছিল বিরাট একটি একান্নবর্তী সংসারে।

রক্ষণশীল গোঁড়া সংসার—যেখানে মেয়ে-মানুষের পক্ষে কথা বলাই মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য। সে ছোটো বয়সেই বাবাকে হারিয়েছিল। দাদারা, ছোটো ভাইরা, মামা-মামি, মামাতো ভাই-বোনরা—এতগুলি লোকের মধ্যে বড়ো হয়েছিল।

সে তার নিজের কণ্ঠস্বর শোনেই নি কোনোদিন। সে পরিবেশে কোনো মেয়ে যদি জোরে কথা বলে, তাকে পাগল মনে করা হয়। কারণ অসুজার এক মাসি সত্যিই পাগল ছিল। ইদানীং দু-বছর রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার পর তার মনে হয়েছে যেন সারা বিশ্বই তার শত্রু। ফলে তার এতদিনের অবদমিত কণ্ঠস্বর ক্ষোভে আক্রোশে ফেটে পড়তে লাগল।

বিয়ের পর কয়েক বছর সুখেই কেটেছিল অসুজার। ঐতিহ্যশৃঙ্খলিত বড়ো সংসারে মানুষ হওয়ার দরুন অসুজার নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না। কোনো বিষয়ে টান বা অভিরুচি দেখা যায় নি তার। ভাস্কর তার নিজের রুচিকে অসুজার উপর আরোপ করতে চায় নি। ফলে অসুজার মনে হত ভাস্কর তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

ঠিক সেই সময় রোগে আক্রান্ত হয়েছিল অসুজা। তখন রমা দু বছরের শিশু।

অসুজার মনের বিকৃতির কারণ হলেন তার মা। তিনি তাঁর স্বামীকে হারিয়েছিলেন অল্প বয়সেই। তাই তিনি স্বামীকে হারানোর দুঃখ ভালোই বুঝতেন। প্রথম থেকেই তাঁর সন্দেহ ছিল যে অসুজা তার স্বামীর উপযুক্ত নয়। মেয়ে রোগে আক্রান্ত হলে ভয় তাঁকে পেয়ে বসল। স্ত্রীর দৈহিক আকর্ষণও যদি নষ্ট হয়ে যায়, ভাস্কর অসুজাকে গ্রাহ্য করবে কেন? অসুজার মা চেয়েছিলেন ভাস্করের মনে একরকম দোষী-মনোভাব সৃষ্টি করতে যাতে সে তার স্ত্রীর রোগের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করে। ভদ্রমহিলা ভেবেছিলেন যে এমন অবস্থায় ভাস্কর নিজেকে স্ত্রীর কাছে ঋণী মনে করবে আর এর ফলে অসুজার কোনো বিপদ থাকবে না। তিনি ভাস্করকে শুনিয়ে-শুনিয়ে মেয়েকে বলতেন, স্ত্রীকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না এমন স্বামী কত দেখি! তোমার অদৃষ্ট খারাপ, তাই তুমি রাত নেই, দিন নেই স্বামীর সেবাশুশ্রূষায় নিজেকে ক্ষইয়ে দিয়ে এই রোগ ডেকে এনেছ। তুমি নিজেই তোমার শত্রু।

মায়ের এই শিক্ষার ফলে আরো বিগড়ে গেল অসুজার মেজাজ··

'হ্যালো ভাস্কর, গভীর চিন্তায় মগ্ন যে!' কথা বলল সুন্দরেশ, ভাস্করের বন্ধু।

'চিন্তার চোটে তোমায় মাথাটা ফেটে যেতে পারে কোনো সময়। ব্যাপারটা কী ভাস্কর? আমাকে বলা যাবে তো?'

ভাস্কর টের পেল সে অফিসের দরজায় এসে পৌঁছেছে। তার আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। সে তার স্বাভাবিক উচ্ছলতাকে ফিরে পেয়ে বলল, 'চিন্তার বিষয়ের অভাব কী? এই ধর দেশের একদিকে বন্যা, অন্যদিকে খরা, সব জায়গায় দারিদ্র্য আর বেকারের সমস্যা, তার উপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর ভাষাগত মারামারি। মানুষ নিশ্চিন্ত থাকবে কী করে?'

'ইয়ার্কি ছাড়ো, ভাস্কর! যদি বলতে না চাও বোলো না।'

ভাস্করের হাসি পেল। তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে সুন্দরেশের এত আগ্রহ কেন? সেও তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে না কি? হয়তো সে ভাস্করের অবস্থা থেকে নিজেই কিছু আশ্বাস পেতে চায়।

কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান তো হচ্ছে না।

মানুষ সবচেয়ে বেশি ভয় করে তার একাকিত্বকে, তার নিঃসঙ্গতাকে। তাই তার সমস্ত জীবন ধরে এই নিঃসঙ্গতা থেকে পালানোর চেষ্টা। এই নিঃসঙ্গতার আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার জন্যই সে স্বামী-স্ত্রী, পরিবার, সমাজ ইত্যাদির কবচ বানিয়ে তার মধ্যে ঢুকে যায়। কিন্তু এসব চেষ্টা কি সফল হয়? সে কি সত্যিসত্যি নিঃসঙ্গতা থেকে রেহাই পায়?

ভাস্কর অফিসে তার ঘরে গিয়ে বসল। টেবিলের ওপর গাদা-গাদা ফাইল। সে কিছুক্ষণ ফাইলের স্তূপের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তার মনে হল যেন ফাইলের স্তূপ ক্রমে বাড়তে-বাড়তে পাহাড় হয়ে সমস্ত

দুনিয়া ছেয়ে ফেলছে।

এই ফাইলগুলি। এমনি পড়ে থাকলে ক্ষতি কী? সমস্ত দুনিয়া কি বসে আছে তার সইয়ের অপেক্ষায়?

'গুড মর্নিং!'

ভাস্কর মুখ তুলে চাইল। সামনে কোম্পানির হস্টেস এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টার চোপড়ার কনফিডেন্সিয়াল সেক্রেটারি মিস উষা আদওয়ানি। তার মুখে স্থায়িভাবে লেগে থাকে একটি অমায়িক হাসি। কোনো বাচ্চা দুষ্টুমি করে সেটা লুকোবার চেষ্টায় যেমন হাসে, তেমনি।

'গুড মর্নিং!'

উষা তার কাছে এসে দাঁড়াল। সে যে সেনট ব্যবহার করে সেটা নিশ্চয় চোপড়া এনেছে বিদেশ থেকে। কল্পনাকে নাচিয়ে তোলার গন্ধ।

চোপড়া ভাস্করকে ভালোবাসে বিশেষ ভাবে। কারণ সে ভাস্কর ছাড়া আর কারো সঙ্গে সাহিত্য, আর্ট, ফিলসফি নিয়ে কথা বলতে পারে না। অন্য সবাই টাকা ছাড়া আর কোনো জিনিস বোঝে না।

মাঝে-মাঝে ভাস্করের আশ্চর্য লাগে, চোপড়া প্রোফেসারি না করে ব্যাবসাতে নামল কেন? ভাস্কর সম্বন্ধে অনুরূপ বিস্ময় চোপড়ারও। এই পারস্পরিক বিস্ময়ই দুইজনকে অন্তরঙ্গ করে তুলেছে।

'মিস্টার চোপড়া আপনাকে ডাকছেন।' উষা বলল। ভাস্করের অবস্থা দেখে মায়া হল তার। সে ভাস্করের কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার অসুখ করেছে?'

ভাস্কর উত্তর দিল না। সে কারো সমবেদনা চায় নি। সে চোপড়ার ঘরে ঢুকল।

'কাম ইন, ভাস্কর।'

ভাস্কর চোপড়ার সামনে একটি চেয়ারে বসে পড়ল।

তার দিকে তাকিয়ে চোপড়া বলল, 'আপনার কিছু ছুটি যদি দরকার হয় নিতে পারেন।'

চোপড়া তাকে আশ্বাস দিচ্ছে, না বিদ্রূপ করছে ভাস্কর বুঝতে পারল না। সে শুধু ম্লান হাসল।

'আপনার স্ত্রীর শরীরটা কেমন?'

'এখন একটু ভালো।'

'একটু ভালো মানে? ···আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি বলে আমাকে ভুল বুঝবেন না, প্লীজ! ···আপনার স্ত্রী সব বিষয়ে···মানে স-অ-ব বিষয়েই স্ত্রীর ভূমিকা পালন করছেন তো?'

ভাস্কর উত্তর দিল না। তার মুখ রাঙা হয়ে গেল। অস্বস্তিতে, না লজ্জায় সে নিজেই বুঝতে পারল না।

চোপড়া একজন পাকা ব্যবসায়ী। সে বিয়ে করে নি। মর‍্যালিটি নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। যৌন ব্যাপারে তার বিচার খুবই স্বতন্ত্র। নৈতিকতার দোহাই দিয়ে ইন্দ্রিয়দমনে তার বিশ্বাস নেই। তার দৃঢ় ধারণা, যৌনসহবাস-জনিত পূর্ণ তৃপ্তি না হলে মানুষ জীবনের অন্য সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে না।

ভাস্কর বলল, 'আজ ফাইল দেখব।'

'আগে নিজের দিকে চেয়ে দেখুন! ফাইল যাবে কোথায়? আপনি কিছু দিন রেস্ট নিন। আপনার স্ত্রীকে···বা অন্য কাউকে···নিয়ে দু-চার দিন কোথাও ঘুরে আসুন। মন একটু হালকা হবে।'

'কী বললেন—স্ত্রীকে বা অন্য কাউকে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ···' চোখ টিপে মুচকি হাসল চোপড়া। 'অন্য কেউ হলে ক্ষতি কী? প্রতি মুহূর্তকে সেই মুহূর্তের জন্য উপভোগ করাটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।'

'আমি সে পরিবেশে মানুষ হই নি।'

'তার মানে আপনি এখনও মানুষ হন নি।' চোপড়া হাসল।

'মানুষ হওয়া সম্বন্ধে আপনার ধারণা চূড়ান্ত নাও হতে পারে।'

'সে নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। জীবনের প্রতিটি ক্ষণই একটি নতুন জীবন, এটাই আমার

বিশ্বাস। একটা উর্দু কবিতায় আছে···"বিগত ক্ষণকে বর্তমান ক্ষণ জিজ্ঞেস করে—অচেনা, তুমি কে?" এই পরিবেশেই মানুষ হয়েছি আমি।'

বিস্মিত হল ভাস্কর। চোপড়ার জীবনদর্শন কত স্বাধীন, কত দ্বন্দ্বহীন! অনুশাসনের বাধা না মেনে এরকম জীবনযাপন করায় কত সুবিধে! প্রতিক্ষণই একটি নতুন বিস্ময়, একটি নতুন অভিজ্ঞতা!···

দরজার কড়ানাড়া রোজ ঘটে এবং বারবার ঘটে, তবু প্রতিবারই প্রবল আগ্রহ হয় 'কে এসেছে' জানবার জন্য। যদি জীবনের প্রতি মুহূর্তকেই এভাবে গ্রহণ করা যায়, তা হলে মনে উৎসাহ এবং ফূর্তির অভাব হবে না, অবসাদের অবকাশ থাকবে না।

বিগত ক্ষণকে বর্তমান ক্ষণ জিজ্ঞেস করে, 'অচেনা, তুমি কে?'

জীবনের ঘটনাগুলিকে একটি অবিচ্ছেদ্য কার্য-কারণপরম্পরাবদ্ধ বলে মনে করাতেই না যত সব সংঘর্ষ, অশান্তি, অতৃপ্তি। প্রতিটি চলমান ক্ষণকে যদি একটি স্বতন্ত্র নতুন জীবন বলে ধরে নেওয়া যায় তা হলে বিবেকের দংশন থাকবে না, অশান্তির অবকাশ নেই, অনুতাপের দরকার নেই।

চোপড়া বলল, 'আপনি সোজাসুজি উত্তর দিচ্ছেন না। যাক, আমি যদি আপনাকে অশান্ত মনে করি, আমার ধারণা ভুল হবে কি?'

'না।'

'এরকম মানসিক সংঘর্ষ আমার হয় না। আমার বিশ্বাস মানুষ নিজেকেই ভয় করে বেশি। সমাজের তথাকথিত নৈতিক মানদণ্ডগুলি তাকে পাগল করে দিয়েছে। ফলে মানুষের জীবন হয়েছে পরস্পর-বিরোধী ভাবগুলির সংঘর্ষস্থল।···আমি সমাজকে গ্রাহ্য করি না। আমার জীবন আমার নিজের, তাতে আর কারো অধিকার নেই। তাই জীবনের প্রতি মুহূর্তই আমার কাছে অমর।···আমার কথাটা শুনবেন? সমাজকে ভুলে যান আর জীবনকে উপ-ভোগ করুন অবাধে।'

চোপড়া সত্যিই একটি আশ্চর্য প্রকৃতির মানুষ। তার মধ্যে ঘটেছে অগাধ বিদ্যার সঙ্গে ব্যবসায়িক সামর্থ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ। সে রপ্তানির নিয়ম এবং বিদেশী মুদ্রা সম্বন্ধে কথা বলতে যেমন দক্ষ, তেমনিই দক্ষ অদ্বৈতবাদের চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে।

চোপড়ার কথা শুনতে-শুনতে ভাস্করের মনে হল যেন অনুজার সঙ্গে তার ঝগড়া নিতান্ত অর্থহীন, অবান্তর! হ্যাঁ, চোপড়ার কথাই ঠিক। কোনো ঘটনাকে তার ভৌতিক ফলাফলের বেশি গুরুত্ব দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ভাস্কর উঠল, 'তা হলে ধরে নিতে পারি যে আমি দু-চার দিনের ছুটি পাচ্ছি।'

'নিশ্চয়!···আর মনে রাখবেন, ফাইলের মুভ-মেন্ট এবং সন্তোষসুখ দুটোই সমানভাবে আবশ্যক।···বুঝলেন?'

'বুঝেছি।'

ভাস্কর বেরিয়ে এল। উষা আদওয়ানি টাইপ করছিল। ভাস্করকে দেখে বলল, 'বস আপনাকে আধঘণ্টা ধরে "বোর" করে ফেলেছেন দেখছি। কিন্তু আপনি তো এতে অভ্যস্ত।'

'কোম্পানি হস্টেস টাইপ করছে যে।···টাইপ করাটা কি হস্টেসের কাজ?'

উষা হাসল, 'পার্টি, পার্টি, সব সময় পার্টি। ঘেন্না ধরে গেল আমার! গোঁফওয়ালা বুড়ো আর গোঁফহীন ছেলেদের সঙ্গে সৌজন্যের হাসি হাসতে-হাসতে আমি পাগল হয়ে গেলাম!' কপালে হাত রাখল সে।

'এক মিনিট অপেক্ষা করো···আসছি' বলে ভাস্কর আবার চোপড়ার ঘরে ঢুকল। চোপড়া পাইপের মধ্যে তামাক পুরছিল। ভাস্কর তাকে বলল, 'উষাকেও দুদিন ছুটি দিতে পারেন?'

চোপড়ার চোখে বিস্ময়। 'নিশ্চয়···যদি তার আপত্তি না থাকে।'

ভাস্কর উষার কাছে গিয়ে বলল, 'বস আমাকে দুদিন ছুটি দিয়েছে। সব সমস্যা ভুলে প্রতিক্ষণকে সেই ক্ষণের জন্যে উপভোগ করব আমি। সেজন্য তোমারও দুদিনের ছুটি মনজুর করিয়ে এসেছি।'

'আপনার কী আস্পর্ধা!'

'তোমার সম্বন্ধে এরকম বলাটা আস্পর্ধা নয়।'

উষা হাসল, 'মিস্টার চোপড়া নিশ্চয় আপনাকে জাদু করেছে। না হলে আপনি এরকম কথা বলতেন না।'

'অবিশ্যি যদি তোমার আপত্তি থাকে জোর করব না।'

'আপত্তি করলে কী করবেন?'

'মেয়েমানুষের আপত্তির একটা আলাদা অর্থ থাকে, জান?'

'মাই গড! শয়তান ঢুকেছে আপনার ভেতরে!'

'জুতে জানোয়ার যেখানে থাকে তার চারদিকে জলের পরিখা থাকে। কারণ জানোয়ার জলকে ভয় পায়। আমিও সে জানোয়ারের মতোই ছিলাম। এখন চোপড়ার কথা শুনে মনে হয়, আমি যাকে জল ভেবে ভয় পেয়েছিলাম সেটা জল নয়, মরীচিকা মাত্র।'

'তা হলে হিংস্র জন্তুটা এবার বেরিয়ে পড়েছে। আমার ভয় করবারই কথা।'

'এই বাঘটা বছরের পর বছর খাঁচার মধ্যে থেকে-থেকে বেড়াল হয়ে গেছে। তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

'আচ্ছা, এখন যাবেন কোথায়?'

'তুমিই বলো কোথায় যাওয়া যায়।'

'ঘর-দোর, স্ত্রী-সংসার···'

উষাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ভাস্কর বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সমাজ, নৈতিকতা, নিয়ম···কত রকমের বেড়া। তুমি 'তুমি' হয়ে, আমি 'আমি' হয়ে থাকবার পথে কত বাধা! সুন্দরী স্ত্রী আর সোনার পুতুল ছেলেকে ত্যাগ করে একাকিত্বের খোঁজে বেরিয়েছিল যে সিদ্ধার্থ, তার আর আমার মধ্যে খুব বেশি তফাত নেই। আমি যেটা করতে যাচ্ছি সেটাও একরকম সন্ন্যাস বই কি।'

'সন্ন্যাস!' বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল উষার চোখ।

'হ্যাঁ, সিদ্ধার্থ স্বর্গ ত্যাগ করল। আমি নরক ত্যাগ করে স্বর্গের সন্ধানে যাচ্ছি।'

'স্বর্গকে ত্যাগ করাটাকে সন্ন্যাস বলা যায়। নরককে ত্যাগ করাটাও সন্ন্যাসের আওতায় পড়ে না কি?'

'ত্যাগ নিয়ে কথা। তা ছাড়া স্বর্গ আর নরকের মধ্যে গুণগত পার্থক্য কিছুই নেই। একটানা স্বর্গানুভূতিও নরকের শামিল। একঘেয়ে না হলে নরকও স্বর্গ হয়ে যাবে। সিদ্ধার্থ সংসার ছাড়ল একটি নূতন অভিজ্ঞতার সন্ধানে।'

'আচ্ছা থাক, এই বিংশ শতাব্দীর সিদ্ধার্থ কোথায় যেতে চাইছে! বনে, না ফাইভ স্টার হোটেলে?'

'আমরা বরং উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় বেরিয়ে পড়ব। আগে ট্যাক্সিতে ওঠা যাক। যেখানে মন চায়, সেখানে যাব—ইনডিয়া গেট, বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক, কুতুবমিনার, পুরনো কেল্লা—'

'আচ্ছা, একটু দাঁড়ান, আসছি···' উষা টয়লেটে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরল। এখন তার ঠোঁট রঙহীন, মাথা থোঁপাহীন।'

'কী ব্যাপার?'

ভাস্করের জিজ্ঞাসার উত্তরে উষা হাসতে-হাসতে বলল, 'আমিও একটি নূতন অভিজ্ঞতার খোঁজে বেরিয়ে পড়ছি।'

ওরা ট্যাক্সিতে উঠল। ভাস্কর ড্রাইভারকে বলল, 'কুতুবমিনার।'

তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল বলে অনুজার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই কি তার এতপরিশ্রম? মনে-মনে নিজেকেই জিজ্ঞেস করল ভাস্কর।

উষাকেও কী একটা চিন্তায় মগ্ন মনে হল। একজন পাগোলের পাল্লায় পড়েছে মনে করছে হয়তো!···না, না, তা যদি হত সাজগোজ খুলে দিয়ে ভাস্করের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত না। এই চাকরিতে ঘেন্না ধরেছে তার। সে মাইনে পাচ্ছে তার হাসি বিক্রি করে।

তার প্রকৃতিলব্ধ সৌন্দর্য তার প্রকৃত অর্থ হারিয়ে ব্যাবসার পুঁজিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার লিপস্টিক-রাঙা হাসির শিকার কত বুড়ো, কত 'গোঁফহীন' ছেলে? ...এই যে ভাস্করের জন্য ঊষা তার বাহ্যাড়ম্বর ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছে, এটা ভাস্করের প্রতি তার পক্ষপাত...

কুতুবমিনার এসে গেল। ওরা ট্যাক্সি থেকে নামল।

'কুতুবমিনার তৈরি হয়েছিল কেন?' ঊষার প্রশ্ন।

'সাধারণত লোকে কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে কাজ করে। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে কুতুবমিনারের বেলায়। এটা বিনা কারণে তৈরি। এর উদ্দেশ্যহীন নির্মাণ জীবনের শূন্যতার প্রতীক। এটা মন্দিরও না, মসজিদও না, কবরও না। এটা হল একটি রাজার হৃদয়ের শূন্যতার, তার চিন্তনের রিক্ততার প্রকাণ্ড পাথুরে রূপায়ণ।...'

ঊষা তার কথায় কান দিল না। সামনে দুজন যুবক একটি যুবতীর হাতে হাত মিলিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ঊষার দৃষ্টি তাদের দিকে।

ভাস্কর ভাবল, তার দীর্ঘ বক্তৃতা ঊষার ভালো লাগে নি। ভালো কাপড়-চোপড় পরে যখন একটি যুবতী সামনে দিয়ে যায় ঊষা 'প্রকাণ্ড শূন্যতা' নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?

ঊষা আর অসুজার মধ্যে তফাতটা কোথায়? ঊষা নিজেই বেছে নিয়েছে এই বেগময় জীবন। তাতে এখন তার ঘেন্না ধরেছে। এখন সে চায় বিয়ে করে, সন্তান উৎপাদন করে, স্বামীকে টাই পরিয়ে তাকে অফিসে পাঠায়। কিন্তু সেরকম জীবন আর তার বরাতে আছে?

একটি বাচ্চা তাদের সামনে এল। তার বয়স হবে তিন বছর। অনেক হেঁটে ক্লান্ত হয়েছে বোধহয়। সে ঊষার কাছে এসে মুখ তুলে দেখল। ঊষা তাকে জড়িয়ে ধরে ভাস্করকে বলল, 'কুতুবমিনারের মানে নেই বলছেন...এর মানে আছে তো?'

ঊষার প্রশ্ন ভাস্করের মুখে ঝাপটা মারল। বাচ্চা রমার কথা মনে পড়ল তার। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল রমার দৌড়ে এসে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরার দৃশ্য।

চোপড়া বলে বিবেক জিনিসটা ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। এটা কি সত্যি? এই বাচ্চাকে দেখেই রমার স্মরণে তার মনের কোণে যে ব্যথার আভাস হল সেটাও কি ভ্রান্তি?...

বাচ্চাটির মা হাসতে-হাসতে তাদের কাছে এল। অপরিচিত লোকের হাতে তার বাচ্চা আদর পাচ্ছে বলে আনন্দে গর্বে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তার মুখ।

ঊষা বাচ্চাটিকে তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে ভাস্করকে বলল, 'বাচ্চার মা হয়তো আমাকে বন্ধ্যা ভাবল।'

ঊষা কথাটা বলল সাধারণ ভাবেই, তবু তার মুখে দুঃখের একটি ক্ষীণ সুর ধরতে পারল ভাস্কর।

'তুমি বিয়ে কর নি কেন, ঊষা?'

'কাকে?'

ঊষার প্রশ্নের গাম্ভীর্যে ভাস্কর হকচকিয়ে গেল। তার মনে হল ঊষা এই প্রশ্ন নিজেকেই বারবার করেছে এবং উত্তর পায় নি এখনো।

ভাস্কর আমতা-আমতা করে বলল, 'চোপড়াকে।'

জোরে হাসতে লাগল ঊষা। হাসির দমকে তার মুখটা লাল হয়ে গেল তবু হাসি থামল না।

ভাস্কর কিছুই বুঝতে পারল না। মেয়েটি পাগল হল না কি? হাসবার মতো তেমন কী ছিল ভাস্করের কথায়? বিয়েটিয়ের ব্যাপারে চোপড়ার বিশ্বাস নেই জেনেও ভাস্কর এ প্রস্তাব করেছে বলে ঊষা হাসছে না কি?

ভাস্করের হাতটা টেনে নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে রেখে তাকে চাপড়াতে-চাপড়াতে হাসতে থাকল ঊষা।

সামনে দিয়ে যারা যাচ্ছিল তারা কিছুক্ষণ থেমে গিয়ে তাদের দিকে তাকাল।

ঊষার ব্যবহারে বিরক্ত হল ভাস্কর, 'তুমি হাসছ কেন?'

'আপনার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে।'

'চোপড়াকে বিয়ে করাটা হাসির ব্যাপার বলে আমার মনে হয় না। উনি এরকম হাসাহাসি পছন্দ করবেন না নিশ্চয়।'

'চোপড়া সম্বন্ধে আপনার জানার অনেক বাকি আছে।'

'তার মানে?'

'আমি চোপড়াকে যেমন অন্তরঙ্গভাবে চিনি তেমনভাবে আপনি চেনেন না, এটা স্বীকার করবেন তো?'

'তা হয়তো ঠিক, যদিও চোপড়ার আর-একটা দিক আমি ভালো করেই চিনি।'

'তা হোক, আপনি কি জানেন, আমি চোপড়াকে বিয়ে করে যদি সতীত্ব রক্ষা করে চলি তা হলে আমার বাচ্চাকে আদর করবার সুযোগ কোনো দিন পাব না ...আপনি ওঁর সম্বন্ধে যা জানেন, তারও অদৃশ্য ভিত্তি এটাই।'

ভাস্করের মনে হল সামনেকার আকাশচুম্বী কুতুবমিনার প্রকাণ্ড শূন্যতার প্রতীক—ভেঙে তছনছ হয়ে পড়ে যাচ্ছে।...

তবে চোপড়া কি আর-একটি প্রকাণ্ড শূন্যতা? তাই তার এই প্রাণপণ চেষ্টা যাতে তার সম্বন্ধে লোকেদের মনে একটি ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়। তার মনের যা অবস্থা তাতে সমাজশৃঙ্খলার প্রতি বা সংসারধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে কী করে? প্রতিক্ষণে ক্ষয়ে-আসা চোপড়া অন্যদের ভোলাবার জন্য বড়ো-বড়ো কথা বলে। 'আমি প্রতিক্ষণকে অমর করে উপভোগ করছি।' উপভোগ করার শক্তিই যার নেই, তার পক্ষে কি আপ্রাণ চেষ্টা তার ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য?

চোপড়া একরকম। অসুজা সম্পূর্ণ বিপরীত আর-এক রকম। চোপড়া জলকে মরীচিকা বলে উপেক্ষা করতে চায়। অসুজা মরীচিকাকে জল বলে ভুল বুঝে নিজের চারপাশে বেড়ার পর বেড়া সৃষ্টি করতে থাকে।

'আমার কথায় খুব আঘাত পেয়েছেন দেখছি।' ঊষা বলল।

'হ্যাঁ, এখন বুঝলাম ওই বাচ্চাটির হাসির তুলনায় কুতুবমিনারের কোনো মানেই নেই।'

ঊষা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখন কোথায় যাব?'

স্থির শান্ত কণ্ঠে ভাস্কর বলল, 'অফিসেই ফিরে যাব। ছুটি শেষ হয়ে গেছে।'

লেখক-পরিচিতি

বিশিষ্ট আধুনিক তামিল লেখকদের মধ্যে অন্যতম ইন্দিরা পার্থসারথি [আসল নাম রঙ্গনাথন্ পার্থসারথি]। তামিলনাড়ুর কুম্ভকোণম শহরে ১৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তামিল সাহিত্যে ডক্টরেট লাভ করে তিনি অনেক বছর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি ওয়ারশ বিদ্যালয়ে এবং কানাডায়ও অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে পণ্ডিচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক বিভাগের অধ্যক্ষ।

শ্রীপার্থসারথি রচনা করেছেন তেরোটি উপন্যাস, কয়েকটি ক্ষুদ্র উপন্যাস, নাটক এবং বহু ছোটো গল্প। তামিলনাড়ু এবং দিল্লির সমাজজীবনের জটিলতা, বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিমানুষের মানসিকতার ঘাত-প্রতিঘাত এবং জীবনসংঘর্ষের ধাক্কায় সম্বলহীন মানুষের অসহায়তার ছবি তিনি এঁকেছেন সুনিপুণভাবে। তাঁর রচনায় আমরা দেখতে পাই সমকালীন সমাজজীবনের যথার্থ প্রতিফলন।

পার্থসারথির উপন্যাস "কুরুক্ষেত্র নাল" সাহিত্য অকাদমি পুরস্কার লাভ করেছে। বর্তমান গল্পের অনুবাদক শ্রীসুব্রমণিয়ম্ কৃষ্ণমূর্তি এই উপন্যাসের বাঙলা অনুবাদ করেছেন "রক্তবন্যা" নামে এবং সেটা সাহিত্য অকাদমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

পার্থসারথির একটি উপন্যাস এবং একটি নাটক তামিলনাড়ু সরকারের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে। তাঁর বহু রচনা অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং তাঁর বহু নাটক অভিনীত হয়ে সর্বভারতীয় স্তরে পুরস্কার লাভ করেছে।

তাঁর ঠিকানা :—141, Venkata Nagar, 4th Cross Street, Pondicherry-605001
Tamil Nadu

সিনেমা

সেলিম ল্যাংড়ে পে মত রো

মেঘ মুখোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে চ্যাপলিন প্রেক্ষাগৃহে প্রসিদ্ধ পরিচালক সৈয়দ মির্জার "সেলিম ল্যাংড়ে পে মত রো" ছবিটি দেখে এবং সম্প্রতি নন্দনে আর-একবার সথ্যু "গর্ম হাওয়া" দেখার সুযোগ পেয়ে দেশের সাম্প্রতিক চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক এবং দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার মধ্যে নোতুন করে অনেক কিছু ভাববার অবকাশ মিলল। এই প্রসঙ্গে মাত্র বছর তিনেক আগে গোবিন্দ নিহালনির টেলিসিরিয়াল "তমস" দেখার অবিস্মরণীয় স্মৃতি মনে উজ্জ্বল হয়ে যে উঠবে তা তো স্বাভাবিক। যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমস্ত ভারতীয় সমাজে দেশভাগের প্রাক্কাল থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল, তার বিরুদ্ধে শিল্পের প্রাথর্যে প্রতিবাদ গড়ে তোলার জন্য প্রায় দু-দশক আগে সথ্যু তৈরি করেছিলেন "গর্ম হাওয়া", আর মাত্র বছর কয়েক আগে সৃষ্টি হল "তমস", কিন্তু আজ বিশ শতকের শেষ দশকের প্রথম বছরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা হতবিহ্বল নেত্রে দেখছি—ইতিহাস থেকে আমরা কিছুই শিক্ষা নিই নি; আমাদের ওই মহত্তম চলচ্চিত্রকর্মগুলি যেন প্রায় বিফলে গেছে। সারা দেশ আবার এক নোতুন ভুলের রক্তাক্ত-ক্লেদাক্ত নিদর্শন স্থাপনের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। মানুষের সভ্যতার এবং মানবিকতার বিপর্যয়ের ইতিহাস বা সেই নির্মম ইতিহাস আশ্রয় করে সৃষ্ট রসোত্তীর্ণ শিল্পকর্ম তবে কি মানুষকে—ব্যক্তিমানুষকে বা সমষ্টিকে তথা জাতিকে কিছুই শেখায় না? মানুষ সেই শিল্পিত ইতিহাস সাময়িকভাবে পড়ে বা শোনে বা দেখে মাত্র? কিয়ৎক্ষণের জন্য উত্তেজিত হয়? কিন্তু সেই আলোড়ন কোনো স্থায়ী অভিজ্ঞান রাখে না তার জীবনাচরণে? স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছর পরে কেন তবে আজ দেশের হাওয়া গরম, কেন সংখ্যালঘু ভারতীয় সম্প্রদায়ের মনে নোতুন আতঙ্ক, কেন আগ্রাসী হিন্দু ধর্মান্ধতার পাষণ্ড তমসায় দেশ আজ আচ্ছন্ন, আর্ত?

"তমস" ধারাবাহিকরূপে দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমে দেখানোর সময়ই দু সম্প্রদায়ের ধর্ম-ব্যবসায়ীরা ক্ষিপ্ত আর কুপিত হয়ে উঠেছিল। দাঙ্গাবাজরা তাদের স্বরূপ চলচ্চিত্রের পর্দায় এমন সত্যরূপে আর কখনো দেখে নি। চলচ্চিত্র কেন, সম্ভবত আর কোনো শিল্পমাধ্যমই তাদের চরিত্র আর কার্যকলাপ এবং সাধারণ মানুষের জীবনের ওপর তার ভয়াবহ প্রভাব এমন তীক্ষ্ণ-তীব্রভাবে প্রকাশ করতে এতকাল সমর্থ হয় নি। যদিও "গর্ম হাওয়া" বা "তমস"-এর বিষয়বস্তু বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম থেকে নেওয়া, কিন্তু সাহিত্যের আয়ত্ত তো কেবল সাক্ষর সমাজ এবং স্বাধীনতার চার দশক পরেও সে সমাজের পরিসর অতি সংকীর্ণ। এদেশে কজনই বা বই পড়েন, কজনকেই বা বই হাতে ধরানোর স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ যত নিরক্ষরই হোক, সে তো সাদা পরদায় দৃশ্যের ভাষা পড়তে সক্ষম : সে আর্তনাদ, কান্না বা বীভৎস উল্লাসধ্বনি বা হত্যার হুঙ্কারের আওয়াজ শুনতে পায়। এসব দেখা ও শোনা তাকে আলোড়িত করে, জাগ্রত করে। সেই যে বুন্যুয়েল বলে গিয়েছেন, চলচ্চিত্রের পরদা একটি বিপজ্জনক এবং আশ্চর্য হাতিয়ার; যদি তা কোনো মুক্তমানস ব্যবহার করে—চলচ্চিত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে এর পর তো

আর কিছু বলার নেই। তাই গ্রন্থের বদলে ধর্ম-ব্যবসায়ীরা যখন চলচ্চিত্রের বিপজ্জনক পরদায় তাদের কৃতকর্মের ছবি ফুটে উঠতে দেখে তারা ওই দৃশ্যবন্ধ ইতিহাস জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর যাতে না হয় তার জন্য উঠেপড়ে লাগে। সথ্যুর, নিহালনির কিংবা অতি সম্প্রতি সৈয়দ মির্জার মুক্তমানস চলচ্চিত্রের পরদাকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে দুঃসাহসের সঙ্গে এবং পরম বিবেকিতায় ব্যবহার করেছে, তা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে গৌরব দান করে।

তিনজন ভিন্ন পরিচালকের সৃষ্টি হলেও এই তিনটি ছবি মিলে আমাদের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক অসাধারণ ট্রিলজি গড়ে তুলেছে। সাধারণত কোনো একটি বিশেষ থিমের প্রসারণ ঘটাবার শৈল্পিক দাবিতে অথবা একই চরিত্র বা ঘটনা বা রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক সূত্রের ক্রমবিকাশ প্রতীয়মান করবার তাগিদে কোনো নাট্যকার, ঔপন্যাসিক বা চিত্র-পরিচালক ট্রিলজির আশ্রয় নেন। গ্রীক নাট্যকারদের এরকম ট্রিলজি বিশ্ববিদিত। বিশ্বসাহিত্যে এরকম নিদর্শন অপর্যাপ্ত। চলচ্চিত্রেও বিভিন্ন দেশের মহৎ পরিচালকেরা উল্লেখযোগ্য ট্রিলজির সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একই যুগের তিনজন পরিচালক কিছু সময়ের ব্যবধানে ভারতীয় মানুষ আর রাষ্ট্রের এক প্রগাঢ় অসুখ আর দীর্ঘস্থায়ী সংকট নিয়ে যে তিনটি ছবি করেছেন, আজ মনে হচ্ছে সেগুলো একসূত্রে গাঁথা। একই থিম বা বিষয়ের যুক্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত বিকাশ ঘটেছে উল্লিখিত তিনটি ছবিতে। এই সূত্রটিকে এরকম বলা যেতে পারে—দেশবিভাগকালীন এবং স্বাধীনোত্তর ভারতীয় মুসলিম সমাজের সংকট এবং অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার উৎকট আলোড়নে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিপন্নতাবোধ।

১৯৭৪ সালে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ Four and a Quarter-এ 'গর্ম হাওয়া' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় মন্তব্য করেছিলেন—In the context of a largely themeless Hindi cinema, Garm Hawa goes to the other extreme of taking a story (by Ismat Chughtai) which for its theme alone would have made the film a milestone···

"গর্ম হাওয়া"র আগে আর কোনো ভারতীয় ফিল্মে এমন প্রধান ও সত্য রূপে এই উপমহাদেশের ব্যবচ্ছেদজনিত সংকট, হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন, স্বাধীন ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অস্তিত্বের অস্বস্তিকরতা এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িকতার উত্থানকে প্রকাশ করা হয় নি। কিংবা বলা যায়, কেবল এমন প্রকট প্রবল বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি তৈরি করার চিন্তা কেউ করেন নি। ধর্মীয় কুসংস্কার বা হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সত্যজিৎ রায় "দেবী" এবং "সদ্গত" তৈরি করে সাহসিকতার এক মাত্রা সৃজন করেছিলেন অবশ্যই এবং ওই দুটি ছবি শিল্পনৈপুণ্যেও উত্তীর্ণ। তবুও যে হতদরিদ্র দেশে বছরে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের চেয়ে বেশি ফিল্ম উৎপন্ন হয়, যেখানে সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল সৎ চলচ্চিত্রের বনিয়াদ গড়েছেন, এবং কর্মরত আছেন, সেখানে সত্তর দশকের প্রথম দিকে "গর্ম হাওয়া"র আগে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার সর্বগ্রাসী আগুন নিয়ে কোনো ছবি হল না কেন—এ বড়ো বিস্ময়ের। এবং "গর্ম হাওয়া"র পর প্রায় দু দশকে আমরা পেয়েছি আর মাত্র দুটি ছবি - "তমস" এবং "সেলিম ল্যাংড়ে পে মৎ রো।" কেবল মাত্র মুসলিম চরিত্র, তাদের সংসার নিয়ে "সেলিম ল্যাংড়ে"র আগে আর কোনো ছবি দেখেছি বলে মনে করতে পারি না—"গর্ম হাওয়া"র কথা বাদ দিলে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে মুসলমানদের সব সময় পার্শ্বচরিত্র হিসেবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। পার্শ্বচরিত্ররূপে আবার যে মুসলিম চরিত্রগুলি হাজির করা হয় তা সংখ্যাগুরুদের মনোমতো গড়া, তাদের একটা মুসলিম গোছের ভাবভঙ্গি বা পোশাক-আশাক থাকে বটে, কিন্তু আত্মা থাকে না। তাই

"গর্ম হাওয়া"র এক যুগ পরে সম্প্রতি "সেলিম ল্যাংড়ে" দেখে অভিভূত হতে হয়। স্বাধীন ভারতে তরুণ মুসলমান সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধিকে কেন্দ্র করে "সেলিম ল্যাংড়ে" ছবিতে বোম্বের এক মুসলমান মহল্লার দরিদ্র এক মুসলিম পরিবারের যে কাহিনী দক্ষ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনভাবে আপন করে এদের কথা সিনেমায় আগে কেউ বলে নি।

"গর্ম হাওয়া"র সঙ্গে "সেলিম ল্যাংড়ে"র একটা প্রধান তফাত হল যে প্রথম ছবিটি স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অনিবার্য ফলস্বরূপ দেশভাগের পরিণতির বুকে দাঁড়িয়ে হিন্দুপ্রধান এক দেশে সংখ্যালঘু একটি পরিবারের সংকটের মর্মান্তিক রূপ দেখিয়েছে, কিন্তু কিন্তু পরবর্তী ছবিটি স্বাধীনতার অনেক বছর বাদের এক থিতু সমাজের মুসলমান পরিবারের করুণ জীবনসংগ্রামের চিত্ররূপ। সেলিম নামের এক থোঁড়া মুসলমান যুবক—যে সম্ভবত অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত —জীবিকা হিসেবে মহানগরের অন্ধকার জগতের কাজ বেছে নিয়েছে। সে তার আরো দু স্বধর্মীয় তরুণকে সাগরেদ করে চুরি ছিনতাই মাস্তানি করে বেড়ায়। বড়ো-বড়ো মাতব্বর অপরাধীদের হয়ে সে নানা কাজ হাশিল করে সামান্য বখরা পায় আর তাতেই সে প্রায় সন্তুষ্ট, যদিও মাঝে-মাঝে এরকম ছোটোখাটো অপরাধের কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে সে বড়ো অপরাধীদের মোহময় জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখে, যেখানে পুলিশ তাকে হেনস্থা করবে না বরং সমঝে চলবে, সে সমাজের আইনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠাবসা করবে। পরি-চালক ছবির প্রথমে আমাদের সেলিমের জীবিকা এবং সঙ্গী-সাথীসহ কাজের বৃত্ত ও বাঁচার পরিবেশের পরিচয় দিয়ে ক্রমশ তার পারিবারিক জীবনের ভেতরে নিয়ে আসেন। সেখানে আমরা দেখি এক কাজ-খোয়ানো বিষণ্ণ বাবা, সেলাই মেশিন চালিয়ে কিঞ্চিৎ রোজগারের চেষ্টারত মা আর বিবাহযোগ্যা বোনের অস্বচ্ছল সংসার। বোঝা যায়, সেলিমের অসহুপায়ের উপার্জন সংসারকে টিকিয়ে রেখেছে। এক দাদা ছিল ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত, সমাজের চোখে সম্মানজনক, কাজ করত ইলেকট্রিসিয়ানের। ইলেকট্রিকের কাজ করার সময় দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। ঘরের তাকে তার ছবি। বোন আনিসের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয় আসলাম নামের এক যুবার সঙ্গে, যে সেলিমের মতো গুণ্ডা-মস্তান নয়। সেলিম বোনকে খুব ভালোবাসে, সুপাত্রে বিয়ে দিতে চায়, বোনকে সুখী দেখতে চায়। তাই সে বাবা-মার মুখ থেকে আসলামের খবর পেয়ে তার ডেরায় যায় তত্ত্বতালাশ করতে। এইখানে ছবিটি মোড় নেয়। আসলাম চরিত্রটি সেলিমের জীবনে এক উদ্ভাসন হয়ে দেখা দেয়, তার স্বরূপ চিনতে তাকে সাহায্য করে। আসলাম সহুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে। সে খবরের কাগজে প্রুফ দেখে, আরো নানা টুকিটাকি কাজ করে। তার ঘরে নানারকম বইপত্র দেখে, ভদ্রসভ্য জীবনযাপন দেখে সেলিমের সম্ভ্রম হয়। কিন্তু এরকম সৎ পথে থেকে আসলাম যা রোজগার করে তা মহানগরে একার থাকার পক্ষেই অকুলান, তো সে বিবি পুষবে কী—জেনে সেলিম হেসে ওঠে, রেগে যায় এবং বিয়ে ভেস্তে দেয়। এইখান থেকে দুই মুসলমান যুবার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তাদের যুক্তি-তর্কের পথ ধরে পরিচালক স্বাধীন ভারতে সাধারণ মুসলমান তরুণসমাজের সঙ্কটজনক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। সেলিম বলে যে—মুসলমানদের কেউ বিশ্বাস করে না, তাদের দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিতে চায় না, তাদের চাকরি হয় না। তাই তাদের এরকম সেলিম বনে যেতে হয়, এবং এ-ই ভালো। আসলাম বিপক্ষে বলে যে মুসলিম তরুণরা বিদ্বান হতে চায় না, তারা বিদ্যাবিমুখ হয়ে অন্ধকার জগতের হাত-ছানিতে সাড়া দিতে সহজেই প্রলুব্ধ হয় এবং সর্বনাশ ডেকে আনে। চেষ্টা করলে তারা অবশ্যই সমাজের সম্মাননীয় নাগরিক হতে পারবে। আসলে চাই সদিচ্ছা, আয়াসসাধ্য পথে হাঁটার স্পৃহা।

এ-জাতীয় যুক্তিতর্কের সময় মনে হতে পারে যে

পরিচালক যেন মুসলিম তরুণদের হয়ে বড়ো বেশি ওকালতি করছেন। কিন্তু এরকম মনে হওয়ার ভিত্তি নেই। আসলে তিনি আজকের ভারতে মুসলিম তরুণ-সম্প্রদায়ের পশ্চাৎপদতার অভ্যন্তরীণ কারণগুলোর অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। নিজে ভেবেছেন এবং সমাজের সকলকে ভাবতে বলেছেন। তাদের যুবাদের হতাশাজনক অবস্থার জন্য সেকেলে এবং ধর্মীয়, বিজ্ঞানবিমুখ ধ্যানধারণা যে কতটা দায়ী—তা তিনি একটা সিকোয়েনসে চমৎকার দেখিয়েছেন। যেখানে এক রাত্রে হঠাৎ মুসলিম প্রবীণেরা আসলামের বাসার উপর চড়াও হয়ে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে এবং এবং শাসাতে থাকে। তার অপরাধ যে সে মুসলিম তরুণীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার কুপথে চালিত করেছে। তাছাড়া, মির্জার সপক্ষে বলা যায় বঞ্চিত-লাঞ্ছিত পিছিয়ে-পড়া মানুষের পক্ষ নেওয়া এবং সেজন্য সমাজকে সচেতন এবং সতর্ক করা তো শিল্পীর দায়দায়িত্ব।

আসলামের বড়ো-বড়ো কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে সেলিম নিজের পিছল জগতে আয়েসেই থাকে কিন্তু আসলামকে সে ভুলতে পারে না। আসলাম তার বিবেককে খুঁচিয়েছে, তার ঘুমন্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়েছে। সে গোপনে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। ইতিমধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে তাদের অন্ধকার জগতে। সেখানে সর্বদা নানারকম চক্রান্ত, নানা ঝুঁকি, পদে-পদে হয়রানি আর মৃত্যুভয়। এই জগতের জীবরা কখনো স্বস্তিতে থাকতে পায় না। অদৃশ্য আসলামের প্রভাবে বিপথগামী সেলিম সহজ-সরল-জীবন-জীবিকার স্বাদ পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সে তার দুই সাগরেদ-কে তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। এমন সময় হঠাৎ বসদের কাছ থেকে ডাক আসে। ওরা তাকে একটা গুণ্ডামির অপারেশনে যোগ দিতে বলে। সেলিম তাদের পরিকল্পনা শুনে বুঝতে পারে যে এই গুণ্ডামিকে উপলক্ষ করে একটা বড়ো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যাবে কিংবা দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তার সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। সে দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ওদের মুখের উপর জানিয়ে দেয় যে, সে এ পথ ছেড়ে দিয়েছে। সে ভালো হতে চায়, সে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো বাঁচবে।

সেলিমের এই আত্মআবিষ্কার এবং দাঙ্গাবাজদের ক্রীড়নক হতে অস্বীকার করার মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্রটি মহত্ত্বকে স্পর্শ করে। সে বুঝতে পারে যে তার অশিক্ষা এবং সৎজীবিকাহীন অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে দাঙ্গার হাতিয়ার করে তোলার পরিকল্পনা ফাঁদা হয়েছে। সে আর নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিল না—এটা এ ছবির এক মস্ত বড়ো দিক। "তমসে" নাথুর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে শুয়োর মারিয়ে মসজিদ চত্বরে ফেলে রেখে দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল। তখন শহর-গ্রামে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে এবং নাথুর নিজের জীবনও তাতে ঝলসে যায়। সেলিমকে আমরা ছবির প্রথম থেকেই খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখি। এই পঙ্গুত্ব কি শুধু শারীরিক? একটা সুস্থ সমাজ থেকে, সহজ জীবন থেকে, স্বাভাবিক জীবিকা থেকে সে বাইরে পড়ে গিয়েছে—এজন্য তার সম্প্রদায়গত ঐ তাহাসিক পশ্চাৎপদতা দায়ী। আবার এও মনে হয়—পরিচালক সৈয়দ মীর্জা ভারতীয় মুসলমান সমাজের যে অনগ্রসরতা আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধার অসুবিধাজনিত যে পঙ্গুত্ব বা খঞ্জত্ব—সেটা নিয়ে এই সমাজকে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করেছেন। বলতে চেয়েছেন, 'লেংড়ে পে মত রো'। সেলিমের ভেতর দিয়েই দেখিয়েছেন চেষ্টা করলে কারো আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্ভ্রমবোধের উন্মেষকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি শাসক সমাজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অবহেলা-তাচ্ছিল্য দায়ী—পরিচালক আমাদের সকলের দৃষ্টি, সহানুভূতি এবং বিচারবুদ্ধি সেলিমকে উপলক্ষ করে সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়ের সঙ্কটের দিকে নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। অবশ্য এই সঙ্কট কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবাদেরই কিনা, নাকি জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয় তরুণ সম্প্রদায়ই দশকের পর দশক এক অসমীচীন ব্যবস্থার শিকার হয়ে এরকম দুর্দশা-কবলিত, বিপথগামী, বিভ্রান্ত—তা ভেবে দেখবার অবকাশ আছে। কারণ হিন্দু ধর্মব্যবসায়ী এবং কায়েমি স্বার্থের পরিপোষকরাও তো হিন্দু যুবাদের প্রলুব্ধ এবং প্ররোচিত করে দাঙ্গার অন্ধ হাতিয়ারে পরিণত করতে সফল হয়েছে, নতুবা বাবরি-মসজিদ-রামজন্মভূমি নিয়ে দেশময় পৈশাচিক উন্মাদনা এবং অযোধ্যায় করসেবার তাণ্ডব কি শুধু বুড়ো রামভক্ত-দের কাজ?

এরকম একটি অসাধারণ ছবি পরিচালক কেন সেলিমের অতর্কিত মৃত্যু দিয়ে শেষ করলেন বোঝা গেল না। বোনের বিয়ের রাতে উৎসবে মত্ত সেলিম যখন বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে রাস্তায় নাচছে। তখন তার এক পুরনো শত্রু আচমকা তাকে ছোরা মেরে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দেয়। এভাবে সেলিম খোঁড়ার জীবনবৃত্ত শেষ হয়। এই মৃত্যু অতর্কিত হলেও হয়তো স্বাভাবিক, তার পুরনো শত্রুকে বিফল-মনোরথ পাণ্ডারাই হয়তো মৃত্যুপরোয়ানা পৌঁছে দেবার কাজে নিযুক্ত করেছিল—অনুমান করে নিলে ভুল হবে না, কিন্তু একজন অসৎ তথা পরিস্থিতির চাপে বিপথগামী মানুষ যখন সচেতন হয়ে উঠছে এবং সুস্থ জীবনে ফিরে আসার সঙ্কল্প করছে, তখনই তার ঘাড়ে বিপর্যয় নেমে আসে—এ যেন গল্পের বাঁধা গত। কাহিনীর সমাপ্তি টানবার সুলভ উপায়। অবশ্য এসব না হলেই বোধ হয় গল্পের বাস্তবতার সুরটা মার খেয়ে যেত।

"গর্ম হাওয়া"র পরের পর ঘাত-প্রতিঘাতে ম্লান এবং আশাহত প্রায়-বৃদ্ধ নায়ক সালিম মির্জা যখন ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাওয়া মনস্থ করে টাঙ্গায় বেরিয়ে পড়েছেন, তখন এক পথের মোড়ে মিছিলে তাঁর টাঙ্গা আটকে গেলে, তাঁর আশাহত যুবকপুত্র যে জীবিকার সংস্থান করতে ব্যর্থ হয়েছে, টাঙ্গা থেকে লাফিয়ে নেমে মিছিলে যোগ দিল আর তাই দেখে যেন পিতারও নতুন বোধের উদ্ভাসন হল, তিনিও টাঙ্গা থেকে নেমে মিছিলে শামিল হলেন—তাঁর ভারতীয়তার পরিচয় খুঁজে পেলেন এবং সেই পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে চললেন—বরং "গর্ম হাওয়া"র এই পরিণতি অনেক বেশি সত্য এবং বাঞ্ছনীয়। কারণ এখানে এক বৃদ্ধ আর তরুণের—যারা উভয়েই বিপর্যস্ত—সাম্প্রদায়িক তাড়নে উদ্ভ্রান্ত, আশাহত—আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় ছাপ আঁকা হয়েছে।

মতামত

১

‘বিক্ষিপ্ত ঘটনার সারফেস রিয়লিটির বিভ্রান্তি ঘোচানোর জন্য ইনার রিয়লিটির অন্বেষণ করা উচিত’

‘ব্যক্তিগত চাপান-উতোর’ বলে শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদারের সঙ্গে আমার বিতর্কের দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নভেম্বর সংখ্যায় একই বিষয়ের জের টেনে শ্রীশক্তিনাথ ঝার চিঠি বেরিয়েছে। চিঠিটি প্রকাশের একটি সঙ্গত কারণ অবশ্যই সমর্থন করি। তা হল, পুরন্দরপুর পাঠাগারের অনুষ্ঠানে যে অধ্যাপককে আমি শ্রীশক্তিনাথ ঝা বলে উল্লেখ করেছিলাম, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি। গত অক্টোবরে গ্রামে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে সেটা জানতে পারি এবং বিব্রত বোধ করি। সুতরাং আমারই সেটা জানানো এবং ভুলের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা কর্তব্য ছিল। তবে তার আগেই শক্তিবাবু জানিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

কিন্তু শক্তিবাবুর বক্তব্য যদি ওই তথ্যগত ত্রুটি উল্লেখেই সীমাবদ্ধ থাকত, আমার এই চিঠি লেখার দরকারই হত না। তিনি আবার বিতর্কিত বিষয়টি সবিস্তারে টেনে এনেছেন। তদুপরি আমাকে অত্যদ্ভুত ধাঁধায় ফেলেছেন।

‘বস্তুবাদী মুসলমান বাউল’ বস্তুটি কী? এযাবৎকাল বস্তুবাদ / বস্তুবাদী বলতে আমরা যা বুঝি, তার নিরিখে ওই টার্মটি কি ‘সোনার পাথরবাটি’ নয়? বাউলরা ‘বস্তুবাদী’ হন কী করে? বাউল-কাল্ট তো মিস্টিসিজম। বাউলরা মিস্টিক, বাঙলায় যাঁদের মরমিয়াপন্থী বলা হয়। বাউল-কাল্টে ‘দেহতত্ত্ব’ নামে একটি টার্ম আছে এবং তা-ও তান্ত্রিক অতীন্দ্রিয়বাদী একটি ধারা মাত্র। বাউল-ফকিরদের মুখে অনেক হেঁয়ালি শোনা যায় বটে, কিন্তু ‘বস্তুবাদী বাউল’—এ হেঁয়ালির জট ছাড়ানো গেল না। শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যাঁরা ভারতীয় বস্তুবাদ নিয়ে বিস্তর চর্চা করেছেন, এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

শক্তিবাবু বাউলফকির-নিগ্রহের যে ঘটনাগুলি উল্লেখ করেছেন, তা থেকে এমন মনে হতে পারে: বীরভূম-মুর্শিবাদ-নদীয়া জেলায় মুসলিমরা তথাকথিত মৌলবাদীদের দাপটে গান শোনাই ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁদের ঘরে রেডিও টি ভি-ভিসিপি নেই। সিনেমা দেখা ছেড়েছেন। যাত্রা-থিয়েটার-পঞ্চরস-লেটো-আলকাপ-বোলান-কবিয়ালি-মারফতি গানের আসরে যান না বা নিজেরাও এসবে অংশ নেন না! সুফিদের (পির) মাজারগুলিতেও উরস বা বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে!

সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা, গানের জন্যই সাত-সাতজন ভাইকে খুন, যাঁদের ‘মুণ্ডহীন ধড়গুলি আর্তনাদ করে’! কাকেও গানের জন্যই বর্শাবিদ্ধ করে রাখা হয়!

বলা দরকার, উল্লিখিত খবরগুলি কাগজপড়ার সূত্রে আমার অগোচর ছিল না। শ্রদ্ধেয় সুভাষদার “বর্তমান” পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাটিও আমি পড়েছিলাম এবং তাতে এই অধমের নামও উল্লেখ করা হয়েছিল প্রসঙ্গত। কিন্তু নানা কারণে আমি কোনো প্রশ্ন তুলি নি।

জীবিকাসূত্রে মহানগরবাসী হলেও আমি মূলত গ্রামের মানুষ। অভিজ্ঞতাসূত্রেই জানি, বরাবর গ্রামাঞ্চলে অ্যানার্কিই স্বাভাবিক নিয়ম। আদিম ট্রাইবাল সমাজের বহু লক্ষণ নিশ্চিহ্ন হয় নি। খুনোখুনি-দাঙ্গা-হাঙ্গামা চিরাচরিত এবং এমন সব দলাদলি তার পিছনে থাকে, শিক্ষিত শহরবাসীর পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন বা অদ্ভুত মনে হতে পারে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিবিধ কারণে অ্যানার্কি বেড়ে গেছে। বেড়েছে খুনোখুনিও। কিন্তু ক্রমশ খুনোখুনির ওপর রাজনৈতিক ছাপ পড়তে শুরু করে। উল্লেখ করা উচিত, ভোটের রাজনীতিও প্রধান উপাদান এবং বহুক্ষেত্রে অনুঘটক।

বহু গ্রাম্য খুনোখুনির প্রকৃত বা অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা বাইরের লোকের পক্ষে বুঝে ওঠা অসম্ভব। অবভাসতত্ত্বের কথা এসে যাচ্ছে। সব ক্ষেত্রেই বাইরের লোকের কাছে প্রতীয়মান বাস্তবই ধর্তব্য হয়ে ওঠে। আবার খবরের কাগজেরও নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, যা দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্টের প্রতিবাদ তত্ত্ব অনুসারে ‘ছাঁচ’ বলা চলে, এবং সেই ছাঁচে ফেলেই খবর পরিবেশিত হয়। কথাকথিত ‘অব্জেকটিভ জার্নালিজম’ নিছক কথার কথা মাত্র। একটি হত্যাকাণ্ড বা হাঙ্গামা একটি তথ্য। কিন্তু কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল, এসব বিচার-বিশ্লেষণের জন্য খবরের কাগজকে শিরোধার্য করার মানে হয় না। কোনও তদন্ত কমিশন বসিয়েও যে কারণাবলি সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় না, তা সহজ যুক্তিবোধ থেকেই বোঝা যায়।

এসব কথা আমার তত্ত্ব নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ এবং আরও অসংখ্য ব্যক্তিরও এগুলি না বোঝার কারণ নেই। যাই হোক, সাতের দশকের প্রথমার্ধে মীনাক্ষীপুরমে ধর্মান্তরের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয় এবং তথাকথিত মুসলিম মৌলবাদকে চিহ্নিত করার হিড়িক পড়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতাকেন্দ্রিক ভোটের রাজনীতি প্রধান থিম হিসেবে বিষয়টি লুফে নেয়। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসনের বিরুদ্ধে ওইসব প্রতিক্রিয়া দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের লড়ার জন্য শক্ত মাটি দেয়। কারণ এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলি মুসলিম-অধ্যুষিত। স্বভাবত, এ অঞ্চলের মুসলিমদের একাংশ পাল্টা-প্রতিক্রিয়ায় আত্মপরিচিতির চরম দুর্গ (আইডেন্টিটি ক্রাইসিসও একটি উপাদান) ধর্মে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নেন। বামপন্থী শাসনের প্রতি মোহভঙ্গের দরুন বিক্ষুব্ধ বামপন্থী এবং প্রাক্তন নকশালপন্থীদের একাংশও পরোক্ষে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীলদের মদত দিতে থাকেন। লক্ষ্য শাসক বাম দুর্গের পতন ঘটানো।

এমন একটা জটিল পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কোনো ঘটনার বিচার করা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গে বরাবরই মুসলিমদের মধ্যে খুনোখুনি বেশি। নিহত লোকটির সঙ্গে রাজনৈতিক দলের দৈবাৎ ক্ষীণতম যোগসূত্র থাকলেই রাজনৈতিক ছাপ পড়ে। লোকটি যদি দৈবাৎ মুসলিম বাউলফকির বা ‘গেনে’ (গায়ক / অভিনেতা / কবিয়াল ইত্যাদি) হয়, অমনই ঘটনাটির গায়ে অধুনা মৌলবাদের ছাপ পড়ে যাচ্ছে।

আমিও একদা ‘গেনে’ ছিলাম। সত্যিই গানকে ‘ছুতো’ করে খুনোখুনি হতে দেখেছি। আলকাপ-জীবনে আমরা ফারাজি মুসলিমদের গ্রাম এড়িয়ে যেতাম। সেটা পাঁচের দশকের কথা। চারের দশকে আমার নিজের গ্রামেই আমার বাঁশি বাজানো নিয়ে দুদলে প্রায় দাঙ্গার উপক্রম হয়েছিল। এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু নিছক ধর্মীয় কারণেই ওইসব খুনোখুনি বা হাঙ্গামা বাধে নি। ফারাজি গ্রামের ভিতর দিয়ে মুসলিম গেনেদের দল গেলে বড়ো জোর তাদের গালাগালি করা হত বা তখনই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চোখ রাঙানো হত, এইমাত্র। সাত-আটের দশকে ঘটনাগুলিকে যেভাবে মৌলবাদের রঙ চড়িয়ে এবং প্রায়-রাজনৈতিক-সাংগঠনিক উদ্যম ও তৎপরতায় ‘খবর’ করে তোলা হচ্ছে, এমন-কী সঙ্ঘসংগঠনও গড়া হচ্ছে, তাতে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদেরই হাত শক্ত হচ্ছে। সঙ্ঘ-সংগঠন করতে দোষ নেই। মুর্শিদাবাদ

জেলার পাঁচথুপির শ্রীপুলকেন্দু সিংহও কান্দিতে লোকসংস্কৃতি সংগঠন করেছেন এবং বাউল-ফকিরদের নিয়ে প্রায়ই অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু তাঁদের কেউ বাধা দেয় না। কারণ তাঁরা মঞ্চ থেকে তথাকথিত মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ভাষণ দেন না। কোনো সংগঠনের উদ্দেশ্য যদি হয় তথাকথিত 'সামাজিক অত্যাচার' থেকে বাউলফকিরদের রক্ষা, তা হলে সেই সংগঠন পরোক্ষে মুসলিম সমাজের বিরোধী হিসেবে স্বভাবত চিহ্নিত হবেই, এবং তদ্বপরি মঞ্চ থেকে ইসলামেরই অন্তর্ভুক্ত একটি শাস্ত্রীয় মতের (তা ভুল হোক আর যা-ই হোক) বিরুদ্ধে ভাষণ দিলে প্রতিক্রিয়ার বশে ওই মতবাদীরা আরও জেদি আর মরিয়া হয়ে উঠবেনই। এটা সরল সত্য।

আমি কখনোই বলছি না, কোনো বাউলফকির নিছক ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হলে তাঁকে রক্ষা করা অন্যায় হবে। পেনাল কোড অনুসারে অত্যাচারীরা অপরাধী। কিন্তু তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়েরই বিরুদ্ধে বিদ্বেষ দানা বাঁধার সুযোগ পায়। দুঃখের বিষয়, খবরের কাগজ এবং কিছু অত্যুৎসাহী ব্যক্তি একটি স্পর্শকাতর বিষয়কে ঘুলিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। বাউল-ফকিরদের রক্ষার নামে কার্যত একটা মুসলিমবিরোধী ফ্রন্ট গড়া হচ্ছে উদ্যোক্তাদেরই নিজেদের অজ্ঞাতসারে। তাঁদের প্রতি আবেদন, মঞ্চের ল্যাঙ্গুয়েজ বদলান।

অগস্ট সংখ্যা চতুরঙ্গে আমি তো বিস্তারিতভাবেই বলেছিলাম, ইসলামে সঙ্গীতবিরোধী একটি শাস্ত্রীয় মত সুদীর্ঘ চোদ্দশো বছর ধরে বিদ্যমান। কাজেই বিক্ষিপ্তভাবে বরাবর কিছু ঘটনা ঘটে। রিজভির বইটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলব—আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে গভীরতর অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে সেমিতীয় ধর্মত্রয় ইহুদি, খ্রীষ্টান মুসলিম ধর্মের তুলনামূলক স্টাডি জরুরি। সারমাদ-সুহ্‌রাউয়ার্দি-মনসুর ছিলেন সুফিবাদের প্রবক্তা। গানের জন্য নয়, ইসলামি চার্চ 'শরিয়াহ্'-এর বিরোধিতার জন্য তাঁদের হত্যা করা হয়। মন্টেগোমারি, আর্নল্ড, অরবেরি, হিট্টি, রড্যাঁস (তাত্ত্বিক মার্কসবাদী), উইনসেক, গিওমে, গার্মানুস (হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত, শান্তিনিকেতনে ইসলামি বিদ্যার প্রধান ছিলেন) প্রমুখের ইসলামসংক্রান্ত বইগুলি এদেশে সুলভ। ইসলামপ্রবক্তার জামাতা আলিরা এক শিয়া হাসান বসরি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকেই এস্টাব্লিশমেন্টবিরোধী একটি দার্শনিক মতবাদের পত্তন করেন,'মুতাজিলাবাদ।' নবম শতকে কিংবদন্তিখ্যাত সুলতান হারুন-উর-রশিদের পুত্র আল-মামুন সুলতান হয়ে মুতাজিলাবাদকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেছিলেন। সুন্নিসম্প্রদায়ের চার উপসম্প্রদায়ের অন্যতম 'হানব ল'দের প্রবক্তা ইমাম হানবলকে তিনি জেলে ঢোকান এবং পরে খতম করেন। সুফিদের সম্পর্কে সুলভ বই ইদরিশ শাহের "দা ওয়ে অব সুফিজ"। ১৯৮৮ সালে রফিক জাকারিয়া "দা স্ট্রাগল উইদিন ইসলাম" নামে বিশাল একটি বই লিখেছেন। এ ছাড়া অসংখ্য প্রামাণিক গবেষণাগ্রন্থের অভাব নেই।

এসব কথা বলার কারণ, সব ধর্মের মতোই ইসলামেও বহু মতবাদ. ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরবিরোধী ধারাও বিদ্যমান। কাজেই কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনার সারফেস রিয়লিটিব বিভ্রান্তি ঘোচানোর জন্য ইনার রিয়লিটি অন্বেষণ করা উচিত। খবরের কাগজ কী ছাপে না বা কী ছেপেছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেখতে হয়, সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি কী? বিশেষ করে ইসলাম কোনো আঞ্চলিক ধর্ম নয়। তাই ইসলাম বা মুসলিমপ্রবণতাসংক্রান্ত বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতটি মাথায় রাখা উচিত। যে ধরনের ঘটনা সহস্রাধিক বছর ধরে বিক্ষিপ্তভাবে ঘটে আসছে, তাকে সমকালের বিশেষ রঙে রাঙিয়ে হইচই তোলার পিছনে কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে বলে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। ঘটনা একভাবে ঘটছে, আধুনিক যুগের শক্তিশালী মিডিয়া বা মঞ্চে তা অন্যভাবে তুলে ধরাতেই আমার আপত্তি। বাউলধ্বংস ফতোয়ার কথা আমিও উল্লেখ করেছিলাম। এমন ঘটনা নতুন নয়। অনেকেই হয়তো শুনে অবাক হবেন, ইসলামের পয়গম্বরপত্নী আয়েশা-বানাম-আলির দ্বন্দ্বের পরিণামে একদল মুসলিম (৭ম শতকে) কাবামসজিদেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এই তো সেদিন এক জঙ্গি গোষ্ঠী জুহাইমানের নেতৃত্বে কাবা দখলের পর কাবাপ্রাঙ্গণ রক্তাক্ত হয়েছিল। অথচ কাবামসজিদ এলাকায় রক্তপাত বা যে কোনো জীবহত্যা নিষিদ্ধ এবং কাবা একটি স্যাংচুয়ারি! ইরাক কুয়েত দখলের সময় বহু মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এগুলির পিছনে ধর্মদ্বেষ কারণ নয়। রাজনৈতিক-সামরিক অভিযানের পরিণাম এসব ঘটনা। বি. এন. পাণ্ডে আউরঙ্গজেবের মসজিদ ধ্বংসের একটি ঘটনার প্রামাণিক তথ্য উল্লেখ করেছেন। মোদ্দা কথা, ধর্ম সব হিংসাত্মক ঘটনার কারণ নয়। প্রকৃত বাস্তবতা খুঁজে বের করা দরকার।

শহরবাসী গবেষকদের ক্ষেত্রসমীক্ষার একটি সেরা নজির দিয়েই কথা শেষ করছি। প্রয়াত ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মুদ্রিত অক্ষরে লিখে গেছেন, আলকাপ মুসলিমদের গান এবং আলকাপ কথাটি আরবি!!

প্রথমত, আলকাপ নিছক গান নয়, অপেরাধর্মী নাটকের দল। নিম্নবর্গীয় হিন্দু-মুসলিমদের এই নাটকের দল নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে "বৈতালিক" উপন্যাস লিখেছিলেন। পাত্রপাত্রী ছিল হিন্দু। দ্বিতীয়ত, আলকাপ আরবি শব্দ নয়। 'আল' প্রাচীন বাঙলা শব্দ। এক্ষেত্রে অর্থ হল রঙ্গরস, কৌতুক। 'কাপ' অর্থও রঙ্গব্যঙ্গাত্মক নাটিকা। 'ঘর-বাড়ি'র মতো দ্বৈতপ্রয়োগ'আলকাপ'। ভারতচন্দ্রের কবিতায় বুড়ো শিবের আলের কথা আছে। সম্বাদ প্রভাকরে পুজোর রাতে 'বাবুদিগের আল' হওয়ার কথা আছে। অথচ প্রয়াত লোকসংস্কৃতিবিদ 'আল' দেখেই টার্মটি আরবি সাব্যস্ত করেছিলেন!!

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কলকাতা-১৪

২

রোগের উৎস সন্ধান না করেই যখন লেখা হয় ব্যবস্থাপত্র

চতুরঙ্গের অগস্ট ১৯৯০ সংখ্যায় সুনীল সেনের "কমিউনিস্ট দুনিয়ায় আলোড়ন ও সমাজবাদের ভবিষ্যৎ" নিবন্ধে কিছু বিপরীতধর্মী মন্তব্য ও কুয়াশা-ধূসর বর্ণনা আমাদের এক বিরাট জিজ্ঞাসাচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

যেমন, লেখক তাঁর রচনার চতুর্থ অনুচ্ছেদ শুরু করেছেন এভাবে: 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পূর্ব ইউরোপে প্রায় সবকটি দেশে প্রধানত লাল ফৌজের সাহায্যে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।··· ··স্তালিনপন্থী নতুন নেতৃত্ব পুরোভাগে আসে। বলপ্রয়োগ ও আমলাতান্ত্রিকতা হয় কমিউনিস্ট একদলীয় শাসনের ভিত্তি।' লেখক এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন নি, তাই মন্তব্য করেছেন—পূর্ব ইউরোপে অশান্তি, ধর্মঘট, বিক্ষোভ। আর অনুক্তির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন—এসব কিছুর মূলে স্তালিনের ভুলনীতি। বর্ণনাটি সর্বাংশে ধূসর। কারণ, লেখক যে সনতারিখের উল্লেখ করেছেন তা ১৯৫৩, ১৯৫৬ এবং ১৯৬৮। এ তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরিসমাপ্তির বহুদিন পরের ঘটনা। তবু কেন এ গণ্ডগোল স্তালিনের গলার হার হয়ে দুলবে—এ কি বাঘ-মেষশাবকের গল্পের সমীকরণে? দ্বিতীয়ত, সেই সময়কার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে—যখন দেশের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ঘাত লেনিনকে গুলি করার মাধ্যমে, কিরভকে খুন করার মাধ্যমে, বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিক গোর্কিকে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিফলিত; যখন নাৎসি শাসকচক্রের লৌহবলয়ে সোভিয়েত সীমান্ত বেষ্টিত—সেই ঘনঘোর দুর্দিনে লালফৌজ যেখানে সেই বলয় ভেঙে এগিয়ে চলেছে প্রতিক্রিয়ারই কেন্দ্রবিন্দু

বার্লিন নগরীর দিকে, সেখানে স্তালিনের কি উচিত ছিল বিজিত প্রত্যেকটি দেশে সমভাবাপন্ন লোকদের শাসনক্ষমতায় আসায় সাহায্য না দিয়ে নাৎসি শাসনচক্রের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে রাশিয়ার সীমান্তে লালফৌজের রাশ টেনে ধরা?

পরবর্তী অনুচ্ছেদে গ্রামসিকে স্মরণ ক'রে লেখক লিখেছেন, 'ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে যায় না।' এই অনুচ্ছেদে ধূসরতা এবং বিপরীতধর্মিতা দুই-ই আছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে—পার্টি নেতৃত্ব তার ভূমিকা পালনে বাধা পেলে কী করবে! সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসনক্ষমতা বিপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে বানপ্রস্থে চলে যাবে কি? আর লেখকের যখন উইদারিঙ অ্যাওয়ে অভ দি স্টেট-এর তত্ত্ব মনে পড়ে, তখন উইদার অ্যাওয়ে করে যাওয়ার আগের পর্যায়ে যে স্টেটের অস্তিত্বের প্রয়োজন এবং স্টেট মানে যে এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণীর শাসন করার হাতিয়ার—এ কথাটাও মনে রাখা প্রয়োজন। আর এঙ্গেলস যখন উইদারিঙ অ্যাওয়ের কথা বলেছেন, তখন পূর্বশর্ত হিসাবে রাষ্ট্র-ক্ষমতায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতত্ত্ব মেনে নিয়েছেন। এই যুক্তির আলোকে বলপ্রয়োগ ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বর্জনীয় বলে মেনে নেওয়া যাচ্ছে কি? প্রাবন্ধিক আরো মনে করেন, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও আমলা-তান্ত্রিকতার প্রসারের ফলে কমিউনিস্ট দুনিয়ায় সামাজিক অগ্রগতির সম্ভাবনা অবরুদ্ধ হয়েছিল। এখানে যদি স্তালিনের সময়ের ইঙ্গিত করা হয়, তাহলে বলতে হয়: তখন, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুর কিছুদিন আগে—হিটলারের উত্থানের সময় যখন সমস্ত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গভীর সঙ্কটে নিমগ্ন, যখন বেকারি, ক্ষুধা আর নৈতিক অবমূল্যায়ন ইউরোপের হৃৎপিণ্ড কামড়ে ধরেছে, যখন ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকে ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যানডের গভর্নর ফ্রান্সের গভর্নরকে লেখেন: "Unless drastic measures are taken to save it, the captalist system throught the civilised world will be wrecked within a year. (*The Great Conspriacy Against Russia*, 3rd Reprint, p 177), তখন অত্যাচারী স্তালিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া দেশে প্রচুর দেশদ্রোহী অন্তর্ঘাতচক্র থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিক উন্নতির দিকে বলদৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। আর শ্রদ্ধেয় সেন যদি সাম্প্রতিক পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ার কথা বলে থাকেন, তবে বলতেই হবে এই অবরুদ্ধতা-নামক অপজাত অপত্য কমিউনিস্ট-নামীয় কিছু দেশের আদর্শবিচ্যুতির করুণ পরিণতি।

লেখকের মতে, 'উগ্রবামপন্থী'রা ('উগ্রবামপন্থী' বলে লেখক কাদের বোঝাতে চাইছেন? তাদের ঘোষিত নীতি কী?) যে মনে করেন রাশিয়ার নীতির ফলেই তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম দুর্বল হচ্ছে, সে ধারণা ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে কিউবা থেকে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজের পশ্চাদপসরণ অথবা ইন্দোনেশিয়ার মাটি লক্ষ কমিউনিস্টের বুকের রক্তে রঞ্জিত হওয়ার কথা নাই-বা টানলাম—তবু বর্তমানে ভারতবর্ষসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সোভিয়েত সাহায্যের শর্তাবলী আলোচনার মধ্যে টেনে আনলে একথা দিনের আলোর মতো প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে ওই শর্তাবলীর সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শর্তাবলীর কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই। সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হয় মুখোশবিহীন সোভিয়েত রাশিয়ার আসল মুখাবয়ব। এতে প্রাজ্ঞজনের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিবিরে সৈনিকের ঘাটতি হচ্ছে।

শ্রদ্ধেয় সুনীলবাবু এক জায়গায় বলেছেন, 'যুদ্ধ বাধলে অগ্রগতির ধারা রুদ্ধ হত। সমাজবাদী আন্দোলনের পশ্চাদপসরণ ঘটত।' ঘটনার ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পারি, দুই বিশ্বযুদ্ধ সামাজিক অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ করে নি এবং সমাজবাদী আন্দোলনও মুখ থুবড়ে পড়ে নি। অবাক বিস্ময়ে

বিপুলা ধরণী অবলোকন করেছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ার বিশাল ভৌগোলিক পরিধিতে শ্রমিক-শ্রেণীর বিজয়কেতন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও দেখা গেল ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছাড়াও এশিয়ার যোজন-বিস্তৃত প্রান্তরে সমাজবাদের অভূতপূর্ব জয়যাত্রা।

পেরেস্ত্রোইকা সম্বন্ধে আমাদের কোনো পরশ্রী-কাতরতা নেই। লেখক স্বীকার করেছেন, পেরেস্ত্রোইকায় 'বাজার অর্থনীতি চালু হবে—যার ভিত্তি প্রতিযোগিতা।' মানেই মুনাফা, আর মুনাফা মানেই শোষণ। এই মুনাফার সূত্র ধরেই মার্কসের যুগান্তকারী আবিষ্কার উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়ম। এই নিয়মের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে সমাজ-বাদের সুপারস্ট্রাকচার। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রভূত পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার প্রশ্নটা মূল কেন্দ্রবিন্দু নয়—মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে উৎপাদনের উদ্দেশ্য: প্রয়োজনভিত্তিক না মুনাফাভিত্তিক। এই অবস্থায় 'ধ্রুপদী মার্কসবাদ' পুরোপুরি গ্রহণ না করে বাজার অর্থনীতি যদি (পেরেস্ত্রোইকার দৌলতে) সমাজতন্ত্রের সঙ্গে একই আসরে পংক্তিভেদে আসন গ্রহণ করতে পারে, তাহলে লেনিন, স্তালিন নন, প্রশ্ন তুলতে হয় মার্কস মনীষী না মাতাল ছিলেন?

নিবন্ধের প্রথম দিকে বলা হয়েছে, 'স্তালিনপর্বে বিশেষ করে ১৯৩০-৪০ কালপর্বে সমাজবাদের ভাব-মূর্তি ম্লান বিবর্ণ হয়েছিল।' এর প্রেক্ষাপট—১৯৩৪ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির ১৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ১১০ জন হয় নিহত হয়েছেন, অথবা আত্মহত্যা করেছেন। এই হত্যা এবং আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানে না গিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে উপরের মন্তব্যের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে বলা যায়—স্তালিনকে সে সময় কাজ করতে হয়েছিল নতুন সহকর্মীদের নিয়ে। লড়াই করতে হয়েছিল অন্তর্ঘাত এবং শত্রুর পরিবেষ্টনীর মধ্যে। এই অবস্থায় ১৯৪১ সালে হিটলার যখন যোজনবিস্তৃত যুদ্ধসীমান্ত উন্মুক্ত করে রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, স্তালিন তখন নতুন সহকর্মী-দের নিয়ে ম্লান নয়, সমাজতন্ত্রের আলেখ্য আলোর রঙে রঙিন করেছিলেন হিটলারের হাত পুড়িয়ে দিয়ে। আরো আছে। এই ম্লান বিবর্ণ ভাবের চিত্রায়ন করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন কৃষি-উৎপাদনের গভীর সঙ্কটের কথা। তখন কৃষিব্যবস্থায় যে গভীর সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তা কি ভুল নীতি নির্ধারণের ফল, না দেশের সর্বত্রে ছড়িয়ে থাকা অন্তর্ঘাতের পরিণাম? তখন প্লেগের জীবাণু ছড়িয়ে সুপরিকল্পিতভাবে হাজার-হাজার বরাহ নিধন করেছিল কোন্ সব বন্য বরাহের দল? অ্যানমিয়া অসুখ ছড়িয়ে একমাত্র বাইলোরা-শিয়ায় ত্রিশ হাজার অশ্ব হত্যা করেছিল যেসব অশ্বতরের দল, তাদের নাড়ীর যোগ ছিল কাদের সঙ্গে?

প্রবন্ধের এক জায়গায় প্রাবন্ধিক বলেছেন, সশস্ত্র বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়া সত্ত্বেও লেনিন জিনোভিয়েভ ও কামেনভের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেন নি। এই দিয়ে বক্তব্য শুরু করে লেখক এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন যাতে সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়—লেনিন যেখানে নীরবে সবকিছু ক্ষমা করে গেছেন, স্তালিন সেখানে সরবে সবকিছুকে শাস্তি দিয়ে গেছেন। অথচ আমরা জানি কিরভ হত্যা মামলায় ধরা পড়েও প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে কামেনভ ও জিনোভিয়েভ প্রাণে বেঁচে যান। আমরা তো এও জানি, যখন সুশ্রীম সোভিয়েত-সহ রাশিয়ার বিপুল জনমত ট্রটস্ক ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার অভিমত জানাচ্ছে, তখন নিষ্ঠুর স্তালিন তাঁর Industralisation and the Right Deviation প্রবন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—'It is one thing to arrest Trotskyist cadres or expel them from the party. It is another thing to put an end to the Trotskyist ideology. That will be more difficult.' প্রবন্ধের শেষের দিকে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'That is why I think the

central point of our fight against the Right deviation must be ideological struggle.' (Works of J. V. Stalin, Vol 11, Moscow—1954, p 289 300) এ শুধু কথার কথাই নয়, আমরা প্রত্যেকেই জানি নিশ্চিতভাবে দলবিরোধী কার্যকলাপে ধরা পড়ার পর ট্রটস্কর মস্তক ঘাতকের কুপাণে দ্বিখণ্ডিত হয় নি। স্তালিন তাঁকে স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে আলমা আতায় স্বাধীন জীবন যাপনের সুযোগ দিয়েছিলেন। অথচ ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস—সেই ট্রটস্কির মস্তক চূর্ণ হয়ে গেল এমন একজন লোকের হাতে—মস্কো থেকে বহুশত মাইল দূরে মেক্সিকোর সুদূর অঞ্চলে এক সুরক্ষিত দুর্গের ভেতরে—যাকে তিনি রাশিয়া পাঠাতে চেয়েছিলেন নতুন করে ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম শুরু করার জন্য। এই ঘটনার ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাকর এই কারণে যে, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক মহিলার নাম। জ্যাকসন তার জবানবন্দিতে আদালতে বলেছিল—'For her sake I deeided to sacrifice myself entirely'। স্তালিনের মৃত্যুর সাঁইত্রিশ বছর পরেও তাঁর বিরুদ্ধে এত অপপ্রচার একটা কথাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে—মার্কসবাদের সপক্ষে লড়াইয়ে dead Stalin is more powerful than Stalin alive।

লেখক স্তালিনের বুদ্ধিহীনতা যে কত গভীর, তা বোঝাবার জন্য বুখারিনের "পলিটিক্যাল টেস্টামেন্ট অভ লেনিন" পড়তে বলেছেন, অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে লেনিন এই বুখারিন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন '...he has never made a study of dialectics and, I think, never fully understood it'।

সাম্প্রতিক কালে সমাজবাদের সংকট সম্বন্ধে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বহু বিদ্বান ব্যক্তির প্রবন্ধ পড়ে দুঃখিত মনে অনুভব করেছি—তাঁরা রোগের উৎস অনুসন্ধান না করেই ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়েছেন। আসলে একটা কথা ভুললে চলবে না—স্তালিন-মাওয়ের সময়ও অভাব ছিল, কিন্তু ঈর্ষা ছিল না—সমভাবে দুঃখ গ্রহণের উদারতা ছিল, একসাথে বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার দৃঢ়তা ছিল। দেশের প্রত্যেক সাধারণ নাগরিক নিজেকে সমষ্টির অংশ বলে ভাবত, তারা জানত—তাদের বোঝানো হত—তুমি যেমন তোমার জন্য, তেমনি দেশের এবং দশের জন্যও বটে। এ ভাবনা ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিরোধী। এই চিন্তা-ধারায় মানুষকে ভাবিত করার লড়াইকে স্তালিন অনেক কঠিন লড়াই বলে বর্ণনা করেছিলেন। বর্তমানে চীন, রাশিয়া সহ একদা সমাজতান্ত্রিক দেশে যে বিপর্যয় হয়েছে, তা সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় নয়, তা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা থেকে বিচ্যুতির পরিণাম।

অরুণশংকর দাশ
মল্লিকপুর
২৪ পরগনা (দ)

৩
অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস রচনায় অসাবধানতা

সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায় : ১৯৩৭-১৯৪৭" পড়লাম। সত্যিই কি এটা "শেষ অধ্যায়"-এর সঠিক ইতিহাস হয়ে উঠতে পেরেছে? ১৯৩৭-৪৭-এর বাঙলার ইতিহাস থেকে যদি ১৯৩৭-৩৮-এর ছাত্রদের বন্দী-মুক্তি আন্দোলন, ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৫-৪৬ এর তেভাগা আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নোয়াখালি অভিযান—এগুলি বাদই চলে যায়, তা হলে তাকে সেই সময়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলা যাবে কি?

এ ছাড়াও আছে বহু তথ্যগত অসঙ্গতি। লেখকের এ ব্যাপারে আরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল।

(১) লেখক আরম্ভ করেছেন বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন থেকে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, নবাব সলিমুল্লা খাঁ 'মুসলমান সমাজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে, লর্ড কার্জনের কুখ্যাত পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার নবাববাড়ি "আহসান-মনজিলে" সারাভারত মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়।' (পৃ ৩৪৫)

কথাগুলি কি ইতিহাসসম্মত? তা হলে তো মেনেই নিতে হয় যে, বাঙলা ভাগের মধ্যেই লুকিয়ে আছে 'মুসলমান সমাজের স্বার্থ'। আর, সলিমুল্লা খাঁ সেই কথা ভেবেই বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন।

কিন্তু ইতিহাস তো অন্য কথা বলে। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার এক বক্তৃতায় মুসলমানদের কাছে এমন এক সম্ভাবনার কথা বলেন যেখানে 'unity which they have not enjoyed since the days of Mussalman Viceroys and Kings'. (Sumit Sarkar, *Modern India*. page 107)

কিন্তু কেন এই প্রস্তাব? কারণ, Bengal united is a power; Bengal divided will pull in several ways. That is perfectly true and is one of the merits of the scheme···It is not altogether easy to reply in a dispatch which is sure to be published without disclosing the fact that in this scheme as in the matter of the amalgamation of Berar to Central Provinces, one of our main objects is to split up and thereby weaken a solid body of opponents to our rule. এই কথাগুলি লিখেছেন ১৯০৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি এবং ৬ই ডিসেম্বরের দুটি নোটে তদানীন্তন ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারি। (*Modern India*, Sumit Sarkar, p 107).

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি—বাঙালি জাতিকে পঙ্গু করার জন্যই বঙ্গভঙ্গ।

ইংরেজের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। সুমিত সরকার *Modern India*-তে আরও লিখেছেন, Yet British responsibility for the encouragement of communal separatism remains an undeniable fact. Fuller had been 'playing off two sections of the population against each other' in the new province, admitted Minto to Morley on 15th August 1906, and his successor had continued the policy of favouring Muslims in new appointments. He also pressed Minto to sanction a Rs. 14 lakh loan to Nawab Salimulla of Dacca as 'a political matter of great importance.' (p 141)

এর পর আসে মুসলিম লীগ গঠনের কথা। ইতিহাস কিন্তু বলে ইংরেজের ইচ্ছেতেই এবং চেষ্টাতেই এর জন্ম, সলিমুল্লার চেষ্টাতে নয়। তিনি ইংরেজের প্রচেষ্টার অংশীদারমাত্র। আগা খাঁ ২৯শে অকটোবর, ১৯০৬ সালে বড়লাট লর্ড মিন্টোর একান্ত সচিবকে কথা দেন যে, He had instructed Mohsin-ul-Mulk 'not to move in any matter before first finding out if the step to be taken, has the full approval of government privately. (p 141)

এমনকী ১৯০৬ সালে প্রধানত আলিগড়ের যে মুসলিম প্রতিনিধিরা ১লা অকটোবর লর্ড মিন্টোর কাছে ডেপুটেশনে গিয়ে যে দাবিপত্র পেশ করেন, যেটা ইতিহাসে সিমলা মেমোরিয়াল বলে পরিচিত, তার প্রাথমিক খসড়া কিছুকাল আগে আবিষ্কৃত হয়েছে তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশের কমিশনারের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে। (Sumit Sarkar,

Modern India, p 141)

(২) ৩৪৬ পাতায় উনি লিখেছেন, 'বাঙলাদেশে এই সময়ে মুসলিম লীগের কোনো প্রভাব না থাকায় এখানকার মুসলিম লীগ নেতারা নির্বাচনে নামার জন্য 'ইউনাইটেড মোসলেম পার্টি' নামে একটি দল গঠন করেন 'যে দলটি নির্বাচনের আগেই ভেঙে যায়। আবার ৩৪৭ পাতায় বলেছেন, 'এই নির্বাচনে ...মুসলিম লীগ ৪০টি, প্রজাপার্টি ৩৮টি আর স্বতন্ত্র (ইনডিপেনডেনট) মুসলমান প্রার্থীরা ৪১টি আসন লাভ করে।' যদি মুসলিম লীগের তখন কোনো প্রভাবই না থেকে থাকে, তা হলে তারা ৪০টি আসন দখল করল কী করে? এই প্রশ্নটা থেকেই যায়।

(৩) ৩৪৮ পাতায় তিনি লিখেছেন, 'কিরণশঙ্কর রায় মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিনিময়ে বিনাবিচারে আটক সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি করেন। ফজলুল হক এই শর্ত গ্রহণ করতে অসম্মত হন, ফলে প্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব ভেঙে যায় এবং হক-লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।' কথাটা কি সম্পূর্ণ সত্যি? সত্যি কথা হল, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কোনো প্রদেশে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত করেন। সেই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা বাঙলা দেশের কংগ্রেস নেতাদের ছিল না, তাই মন্ত্রিসভা হয় নি।

(৪) ৩৫৩ পাতায় 'ফজলুল হক এই অবস্থায় বিধানসভায় লীগের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হন' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লীগের সমর্থনের উপর নির্ভর করেই এই মন্ত্রিসভার জন্ম, কাজেই নতুন করে লীগের সমর্থনের উপর নির্ভর করে মন্ত্রিসভা বাঁচানোর প্রশ্ন উঠছে কা করে? মন্ত্রিত্বটাই তো প্রজা-লীগের মিলিত প্রয়াস।

(৫) হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র আর গান্ধীজীর মধ্যে যে বাদানুবাদ সৃষ্টি হয় তাকে মনে হয় মারোয়াড় স্বার্থ রক্ষার জন্যই গান্ধীজী ওই মন্ত্রিসভা ভাঙতে চান নি। ঘটনাটি সত্যিই কি তাই? তিনি যদি সুভাষচন্দ্রের সম্পূর্ণ চিঠিটা ছাপতেন, তা হলে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হত। তিনি চিঠির যে অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন তাতে সুভাষচন্দ্র বসু কারণ হিসেবে লিখেছেন,

It is imperative in the national interest we should pull down the Huq Ministry as early as possible. The longer the reactionary Ministry remain in office, the more communal will the atmosphere of Bengal become and weaker will be the Congress vis-a vis Muslim League.

এখানে কথা হল, মন্ত্রিসভা যদি reactionary-ই হয়, তাহলে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে মন্ত্রিত্ব করার প্রস্তাবের মধ্যে সতভা কোথায়?

আসল কারণ যে তা নয়, তা সুভাষচন্দ্র ঐ চিঠিতেই গান্ধীজীকে লিখেছেন,

At long last early in November Sjt Nalini Sarkar had been convinced that he should resign from the Huq Ministry. He assured me for the first time on the 9th December, before I left for Wardha that he would resign his office before next budget session. What made him renege from this position in one week, I do not know.

এই পদত্যাগের প্রয়োজনীতা হঠাৎ হল কেন? উত্তর সুভাষচন্দ্র ওই চিঠিতেই জানিয়েছেন। তাঁর মতে,

'The position today is such that a coalition minstry in Sindh, Bengal, Punjab is within domain of practical politics. If the change can be brought about (and in my opinion it can be) the Congress will be in a position to speak to the British Government on behalf of the eleven provincial governments. This will mean that even without Hindu-Muslim settlement the Congress will be officially to represent the people of British India while dealing with British Government and not be seriously handicapped because there has been no settlement with the Muslim Leaque.

এইভাবে কি ভারতবর্ষের মুসলিম জনসাধারণকে সঙ্গে পাওয়া যেত? তাই গান্ধীজী যখন তাঁর পরবর্তী চিঠিতে সুভাষচন্দ্রকে লেখেন,

What is the meaning of ousting Huq Ministry? You will never oust Huq and several other members. Therefore generally speaking it can be said that coalition minintry means, some Congressmen in the ministry with no undertaking that Congress programme will be carried out.

এরপর কি গান্ধীজীর কথাগুলোকে একবারে যুক্তিহীন বলা যাবে? এত কথার পরেও তো গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে লেখেন যে,

Your complaint that I attach more value to the views of three friends is not justified, for it is not their views which have affected me, it is the evidence they gave. Sarat had told me that Nalinibabu was coming, that I should try to influence him to resign, and I did. And he has agreed to resign on the issue I mentioned in my letter.

এর পর সুভাষচন্দ্রের বাধা কোথায় রইল? সুভাষচন্দ্র কিছু করেন নি এ ব্যাপারে কারণ তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি পদের লড়াইতে, পরবর্তী কালে শারীরিক অসুস্থতা এবং গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে বিবাদের ফলে কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়াতে। সে ১৯৪০ সালে।

(৬) ৪৫০ পাতায় কর্পোরেশন নির্বাচনের যে ফলাফল দিয়েছেন তা ত্রুটিপূর্ণ। এই নির্বাচনে প্রথম দুইজন কমিউনিস্ট কর্পোরেশনের কমিশনার নির্বাচিত হন। এঁরা হলেন প্রয়াত সোমনাথ লাহিড়ী এবং মহম্মদ ইসমাইল।

(৭) শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় সবচাইতে বেদনাদায়ক অংশ হল তাঁর ক্রিপস এবং ক্যাবিনেট মিশনের সম্পর্কিত অংশটি। একথা ভাবতে কষ্ট হয় যে তিনি এর পার্থক্য নিজেই জানেন না।

ক্রিপস মিশন বলে যেটা ইতিহাসে পরিচিত সেটা ভারতবর্ষে আসে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে। এই মিশন সদস্য পেথিক লরেন্স বা এ.ভি. আলেক-জাণ্ডার ছিলেন না। ক্যাবিনেট মিশন নামে ইতিহাসে যেটা পরিচিত সেই মিশনের তিনজন সদস্যই ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্য ছিলেন, সেইজন্যই এটা ক্যাবিনেট মিশন নামে পরিচিত। দুটি মিশনই ভারতে পদার্পণ করে মার্চ মাসে। প্রথমটি ১৯৪২ সালে, এবং দ্বিতীয়টি ১৯৪৬ সালে। দুটি মিশনের প্রস্তাব গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই, কারণ দুটো একেবারেই আলাদা ধরনের প্রস্তাব ছিল। ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর তদানীন্তন ভারতসচিব পার্লামেন্টে ১৪ই জুন, ১৯৪৬ মিশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

The statement makes clear that the offer of March 1942 stands in its entirety. That offer was based on two main principles. The first is that no limit is set for Indian freedom to decide for herself her own destiny, whether as free member and partner in the British Commonwealth of nations or even without it. The second principle is that this can only be achieved under a constitution framed by India to which the main elements of India's national life are the consenting factor.

১৯৪৬ সালের ১৬ই মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চার্চিল আমেরির ওই ঘোষণার উল্লেখ করে বলেন,

'Cripps Mission failed, The answer which Mr. Gandhi gave to the British Govt. at that time was "Quit India.'

লেখক যে কোথা থেকে ক্যাবিনেট মিশনের সময় "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনকে আমদানি করলেন জানি না। আর ক্রিপস মিশনের সময় ওয়াভেল কোথা থেকে এলেন? তখন তো বড়লাট লর্ড লিনলিথগো। তিনি ক্রিপস মিশনের নামে ৩০ মার্চ ১৯৪২ যে ঘোষণাটির কথা বলেছেন, ইতিহাস কিন্তু বলে সেই ঘোষণাটি ক্যাবিনেট মিশন করে ১৫ই মে ১৯৪৬ সালে। এধরনের অসাবধানতা যে-কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষেই অমার্জনীয় অপরাধ।

(৮) প্রবন্ধের শেষে লেখক আমাদের জানিয়েছেন '১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব নিয়ে জিন্না যে সংগ্রাম আরম্ভ করেন, পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে সেই সংগ্রাম শেষ হয় এবং জিন্নার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়।' সত্যিই কি তাই? যতদূর জানি জিন্না সাহেব নিজেও তা মনে করেন নি। অন্তত বর্তমানে এবিষয়ে তথ্যের অভাব নাই।

বেণু গুহঠাকুরতা
C o COROSYS
১৩ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩

৪

ভারতীয় রাজ্যগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে ক্যাবিনেট মিশন

সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়: ১৯৩৭-১৯৪৭" পড়লাম। ক্রিপস মিশন ভারতীয় রাজ্যগুলিকে তিনটি গ্রুপ বা দলে ভাগ করেছিলেন বলে লেখক যা লিখেছেন তা ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য নয় বলে মনে হয়। আসলে ব্রিটিশ-ভারতীয় রাজ্যগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে 'ক্যাবিনেট মিশন'। এই মিশনের সদস্য ক্রিপসও ছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬-এর ২৬শে মার্চ এদেশে আসে এবং ১৬ই মে তাদের পরিকল্পনা পেশ করে। তবে ১৯৪২-এ স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে একটি মিশন ভারতে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য ভারতে আসে, তা 'ক্রিপস মিশন' নামে পরিচিত। ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবগুলি ছিল নিম্নরূপ:

(১) যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে।

(২) একই সময়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'সংবিধানসভা' গঠিত হবে এবং ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা করা হবে।

(৩) যদি একাধিক রাষ্ট্র স্বতন্ত্র সংবিধান রচনা করে, তাকেও ভারতীয় ইউনিয়নের সমান মর্যাদা দেওয়া হবে।

(৪) কোনো দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তা স্বীকার করা হবে।

(৫) সংবিধানসভার সদস্যগণ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

(৬) ভারতের দেশরক্ষা ও নিরাপত্তার ভার ব্রিটিশের হাতে থাকবে।

(৭) বড়লাটের কার্যনির্বাহী সভায় আপাতত অধিক সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি নেওয়া হবে।

(৮) সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে পূর্বঘোষিত নীতি বজায় রাখা হবে।

(৯) ভারতবাসীর সহযোগিতা ও সম্পদ যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হবে।

কাজেই ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবে ভারতীয় রাজ্যগুলিকে তিনটি দলে ভাগের কোনো প্রশ্ন ছিল না। ক্রিপসের প্রস্তাবকে ভারতবর্ষের কোনো রাজনৈতিক দল সমর্থন জানায় নি। পক্ষান্তরে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবগুলিকে লীগ প্রথমে সমর্থন জানিয়েছিল, যদিও কংগ্রেস তা মেনে নিতে পারে নি। লর্ড ওয়াভেল ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারেই অন্তবর্তিকালীন সরকার গঠনে ভারতীয়দের আহ্বান জানান (ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব অনুসারে নয়)।

পার্থসারথি রুজ
করিমপুর জগন্নাথ হাইস্কুল পোঃ করিমপুর জেলা: নদীয়া

MORE
FROM
PREMIER IRRIGATION
THE MOST TRUSTED
NAME
IN TEA IRRIGATION
PREMIER IRRIGATION
EQUIPMENT LIMITED
17/1C Alipore Road Calcutta 700 027
Phones : 45 5302/7455/7626
Gram : PREQUI, Telex : 021-2540